সেপ্টেম্বর ১৯৮৯

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

পৃথিবীর বৃহত্তম জলজ উদ্ভিদ

লিখেছেন : এণাক্ষী বিশ্বাস

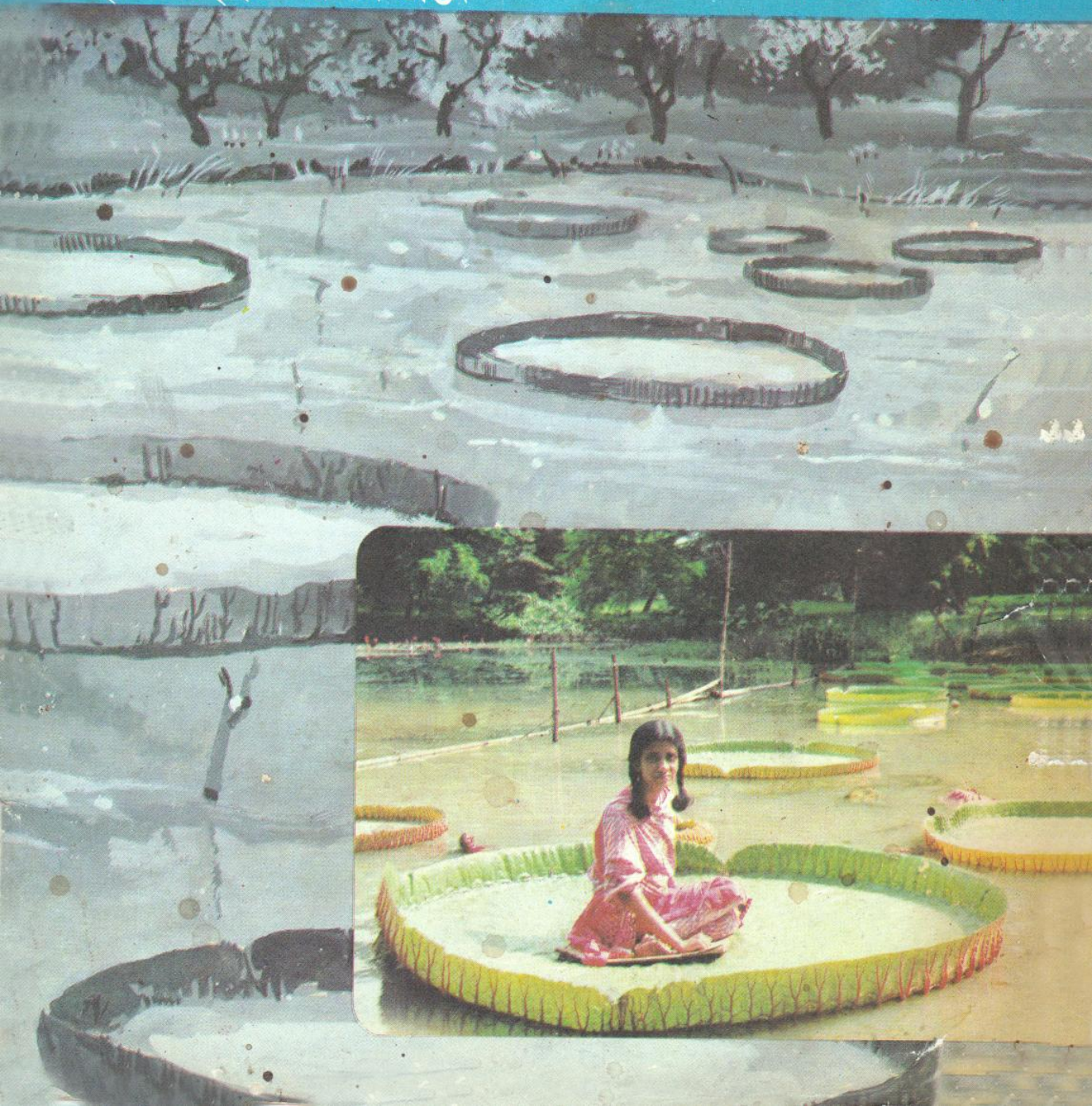

ছোটদের জন্য অভিনব সাধারণ জ্ঞানের বই

দু'খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

যে বই ছেলেমেয়েদের ক্লাসের
পড়াতেও সাহায্য করবে

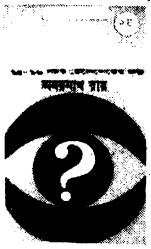

স্টুডেন্ট নলেজ গাইড

১ম : ১০ থেকে ১৪ বছরের জন্য ॥ VI-VIII
২য় : ১৪ থেকে ১৬ বছরের জন্য ॥ IX-X
প্রতি খণ্ড ১২ টাকা ॥ V. P. P. ১৫ টাকা

রবীন্দ্র-পুরস্কারপ্রাপ্ত
গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের

বাঙলার গাছপালা

মূল্য : দশ টাকা

৩০টি আলোকচিত্র

সচিত্র জ্ঞানবিজ্ঞান

এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায় ॥ **বিচিত্র বিজ্ঞান** ৮
অরূপরতন ভট্টাচার্য ॥ **যুক্তিতর্ক হেঁয়ালি** ৮
বিমান বসু ॥ **গ্রহ পরিচয়** ১২
পার্থসারথি চক্রবর্তী
মাটি থেকে আকাশে ১০
গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
বিজ্ঞানের আকস্মিক আবিষ্কার ৮
অমরনাথ রায় ॥ **সংখ্যা নিয়ে খেলা** ৮
জ্ঞানবিজ্ঞানের মজার খেলা ১০
সিদ্ধার্থ ঘোষ
অঙ্কের ম্যাজিক খেলার লজিক ১৫

১৯০১ সাল। পদার্থবিজ্ঞানে প্রথম নোবেল পুরস্কার পেলেন এক্স-রশ্মির আবিষ্কারক ভিলম হেলম কমবাড রয়েন্টগেন। সেই থেকে শুরু। বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ পদক্ষেপের জন্য নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হয়ে আসছেন বিশ্বের বিশিষ্ট বিজ্ঞানীগণ। কিন্তু তাঁদের অবদান ও আবিষ্কারের কথা আমরা কতটুকুই বা জানি ? জনপ্রিয় বিজ্ঞান লেখক সমরজিৎ কর তাঁর স্বাদু কলমে পরিবেশন করেছেন সেইসব রোমাঞ্চকর ও কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য যা গল্প উপন্যাসের চাইতেও রোমাঞ্চকর

বাংলায় বিজ্ঞান রচনায় অগ্রপথিক
সমরজিৎ করের **নোবেল জয়ী বিজ্ঞানী**

তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে ॥ দাম ২০

অঙ্কের ম্যাজিক খেলার লজিক

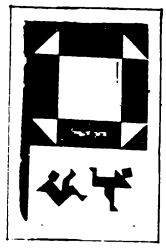

তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে ১৫

খেলার নির্দেশসহ একটি বই
আস্ত বই ও দশরকম খেলার
সরঞ্জাম সহ সিদ্ধার্থ ঘোষের
আশ্চর্য বইয়ের বাক্স।

বুদ্ধি ও মেধা চর্চার জন্য

অমরনাথ রায় ॥ **নলেজ ক্যুইজ** ১০
অরূপরতন ভট্টাচার্য ॥ **গণিত ক্যুইজ** ১০
অমরনাথ রায় ॥ **সায়েন্স ক্যুইজ** ১০
অলক চক্রবর্তী ॥ **ফিজিক্স ক্যুইজ** ১০
অমরনাথ রায় ॥ **কেমিস্ট্রী ক্যুইজ** ১০
তারকমোহন দাস ও সীমা সেন **লাইফ সায়েন্স ক্যুইজ** ১০

বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প

লীলা মজুমদার ॥ কল্পবিজ্ঞানের গল্প ১৫
ক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য ॥ লুপ্তধন ৮
ক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য ॥ মেঘনাদ ১০
অদ্রীশ বর্ধন ॥ কিশোর সায়েন্স ফিকশন ১৫
ক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য
তুষারলোকের রহস্য ৮

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ
৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড কলি-৯

জ্ঞান ও আনন্দের আশ্চর্য সমীকরণ

শারদীয়

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

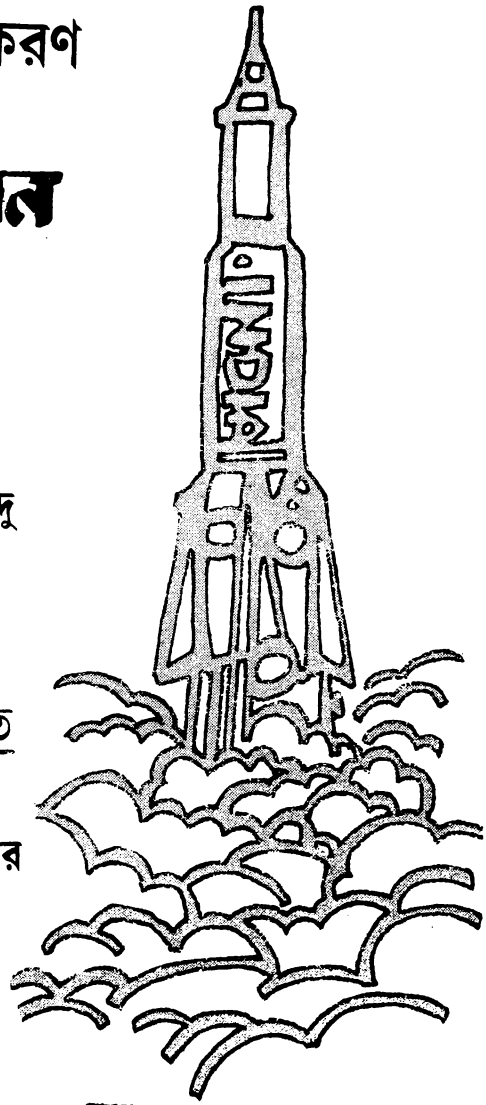

উপন্যাস ও গল্প লিখবেন

লীলা মজুমদার ॥ ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য ॥ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ॥ শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ॥ অদ্রীশ বর্ধন ॥ নিরঞ্জন সিংহ ॥ কিন্নর রায় ॥ সমরজিৎ কর ও অনেকে ।

বিশেষ প্রবন্ধগুচ্ছ : স্বাধীন ভারতে বিজ্ঞানের অগ্রগতি—লিখবেন

জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য ॥ সূর্যেন্দু বিকাশ কর মহাপাত্র ॥ জয়ন্ত বসু ॥ রমাতোষ সরকার ॥ বিমান বসু ॥ দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও অনেকে

শ্রীপান্থ রচিত রোমাঞ্চকর প্রবন্ধ

ছড়া ও কবিতা লিখবেন

অন্নদাশঙ্কর রায় ॥ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ॥ কৃষ্ণ ধর ॥ অমিতাভ চৌধুরী ও অনেকে

সার্কিট ডায়াগ্রাম সহ
কম খরচের দশটি অভিনব মডেল

প্রস্তুতি শুরু হয়েছে
বেরুবে পুজোর আগেই

পুজোর ছুটি ফুরিয়ে গেলেও যে বইয়ের প্রয়োজন ফুরোয় না

বুদ্ধি সুদ্ধি প্রতিযোগিতা 2
সমীর মণ্ডল
শারদীয় কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান '৮৯
'বুদ্ধি-শুদ্ধি'
প্রতিযোগিতার মধ্যে সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর-
দাতাদের আগামী তিন বছরের জন্য বিনামূল্যে কিশোর
জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রাহক করে নেওয়া হবে।
ক
বুদ্ধি সুদ্ধি প্রতিযোগিতা 1
সমীর মণ্ডল
নীচের চারটি নক্সার কোনটি
ভাঁজ করলে ওপরের
বাক্সটি পাওয়া যাবে ?
চরিতা
7432
মাধুরির গাড়ীর

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

নবম বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা
সেপ্টেম্বর 1989

আগামী সংখ্যায়

অক্টো-নভেঃ যুগ্মসংখ্যা

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

সুন্দরবন ঃ জীবন ও জীবিকা

লিখবেন

তারকমোহন দাস

সূচীপত্র

চিঠিপত্র ঃ 4

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর ঃ চাঁদের পর কুড়ি বছর ॥ সমরজিৎ কর 7

প্রচ্ছদ নিবন্ধ ঃ পৃথিবীর বৃহত্তম জলজ উদ্ভিদ ॥ এণাক্ষী বিশ্বাস 19

পড়াশোনা ঃ ভগ্নাংশের ল. সা. গু. ও গ. সা. গ প্রসঙ্গে ॥ অসীম মুখোপাধ্যায় 15 ঃ সহজ কথায় রসায়ন ॥ অমরনাথ রায় 17 ঃ হরমোন সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্নোত্তর ॥ ওমর আহ্‌মেদ 51 ঃ জীবন বিজ্ঞানের টীকা-টিপ্পনী ॥ সৌভিক আচার্য 52 ঃ বরফ যদি গলে ॥ সমীর কুমার ঘোষ 21 ঃ কোন বিজ্ঞানকে কি বলে ॥ অসীম বিশ্বাস 61

বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প ঃ ডাঃ রবি রায়ের বক্তৃতা ॥ নিরঞ্জন সিংহ 35

জীবজন্তু ঃ সমুদ্রের ঘোড়া ॥ শৈবালকুমার গুহ ॥ 29 ঃ অক্টোপাস ॥ দীপাঞ্জন ঘোষ 55

শরীর-স্বাস্থ্য-চিকিৎসা ঃ চিকিৎসা বিজ্ঞানে কমপিউটার ॥ প্রমথেশ দাস 39

ফুল ঃ চৈতি-ফাগুন ফুল ॥ বাপ্পাদিত্য রায়চৌধুরি 11 ঃ পলাশ পিপুলের ভেষজ গুণ ॥ এণাক্ষী বিশ্বাস 14

নিজে নিজে কর ঃ ইলেকট্রিক কানেকশন লক ॥ বিশ্বজিৎ ঘোষ 65 ঃ মডেল বানাতে গিয়ে ॥ রাজেশ গিরি 16 ঃ মডেল এর রকমফের ॥ নির্মলেন্দু বিকাশ পাত্র 54

ফিচার ও ছবিতে গল্প ঃ খুদে বৈজ্ঞানিক ॥ দিলীপ দাস 23 ঃ যুগের ভিতর যুগ ॥ গৌতম কর্মকার ও অনিল কর্মকার 43

প্রতিযোগিতা ঃ ক্যুইজ কনটেস্ট 57 ঃ আই-কিউ টেস্ট 58 ঃ শব্দকূট ॥ বিধান চন্দ্র মণ্ডল 58 ঃ বিভিন্ন প্রতিযোগিতার সমাধান 58

বিতর্ক ঃ আলো নিয়ে সমস্যা ॥ রাহুল রায় 9 ঃ ট্যাকিওন বিতর্ক ॥ শমিত দাস 10

ধারাবাহিক রচনা ঃ বোর্ণিওর বেরী ॥ সংকর্ষণ রায় 31

গাছপালা ঃ নিমের ভেষজ-তত্ত্ব ॥ জীবনকৃষ্ণ সরকার 41

কারিগরি ও প্রযুক্তি ॥ নাবিকের নোঙ্গর ॥ আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় 48

এক্সপেরিমেন্টস ঃ রসায়নের যাদু ॥ ননীগোপাল মণ্ডল 62

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী ঃ জেনে রাখা ভালো 33 ঃ কেমন আছে টাইটানিক ॥ আশিস মান্না 34 ঃ মুক্তা সম্পর্কে দু'চার কথা ॥ তপন কুমার হালদার 27 ঃ নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী ডোনাল্ড জে ক্র্যাম ॥ অমরনাথ রায় 28 ঃ চিত্র থেকে লিপি ॥ কার্তিক ঘোষ 30 ঃ বারকোড কি ? ॥ সিদ্ধার্থ সরকার 42

কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ ঃ সফল উত্তরদাতাদের নাম 63 ঃ পরিষদের খবর 64 ঃ বলতে পারো কেন ॥ সুধাংশু পাত্র 59

জ্ঞানবিজ্ঞানের বই ও পত্রিকা 53 ঃ **বিজ্ঞান সংবাদ** 6 ঃ **বিশ্ব বিজ্ঞান** 6

প্রধান সম্পাদক ঃ **সমরজিৎ কর**
সম্পাদক ঃ **রবীন বল**
সহ সম্পাদক ঃ **জয়ন্ত দত্ত**

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানের পক্ষে রবীন বল কর্তৃক 86/1, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-9 থেকে প্রকাশিত এবং চৌধুরী প্রিন্টিং ওয়ার্কস, P-21, সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীট, কলকাতা-6 থেকে মুদ্রিত। দাম : 5.50 টাকা

প্রচ্ছদ ঃ পুতুল ঘোষাল

চাল থেকে মুড়ি কি ভৌত পরিবর্তন

জুলাই সংখ্যায় "বলতে পারো কেন?" এই বিভাগে চাল থেকে মুড়ি কি ধরনের পরিবর্তন?—এই উত্তরে (May মাসের প্রশ্ন) বা সমাধানে সুধাংশু বাবু যে উত্তরটি লিখেছেন তা নিয়ে সন্দেহ দেখা নিয়েছে। আমি আগেরটি ভৌত পরিবর্তনই জানতাম এবং এ নিয়ে কয়েকজনের সাথে তর্ক হয়। ক্লাস IX এর ভৌত বিজ্ঞান (সুখেন্দু মাইতি) বইতে সুখেন্দুবাবু এটিকে প্রথমে ভৌত পরিবর্তন বলেছিলেন কিন্তু নতুন সংস্করণে তিনি উহাকে রাসায়নিক পরিবর্তন বলেছেন। আমার মতে এটি রাসায়নিক পরিবর্তন কারণ মুড়ি থেকে তো আর চাল পাওয়া যাবে না। 96% স্টার্চ অপরিবর্তিত থাকলেও তাকে তো পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। আমারও সঠিক জানা নেই এবং আমার বন্ধুদের মনেও সংশয় আছে। মাননীয় সুধাংশুবাবু যদি এটি ভালোভাবে আরও সকলের সাথে আলোচনা করে সঠিক উত্তরটি যুক্তি সহকারে জানান তাহলে খুশি ও কৃতজ্ঞ হব। সংশয়ও দূর হবে।

পিনাকী বাগচী, রবীন্দ্রনগর, শিলিগুড়ি

সুধাংশু পাত্রের "বলতে পারো কেন?" বিভাগের জুন '89 সংখ্যায় "চাল থেকে মুড়ি কি ধরনের পরিবর্তন?" প্রশ্নটি পড়লাম। তিনি লিখেছেন যে এই পরিবর্তনটি হয় ভৌত পরিবর্তন। কিন্তু সেটি হবে রাসায়নিক পরিবর্তন। কারণ—চাল ভাজিলে মুড়ি প্রস্তুত হয়। এই অবস্থাতে ইহা মূলত স্টার্চ জাতীয় পদার্থ। কিন্তু ইহাদের আণবিক গঠন ভিন্ন। মুড়ি হইতে পুনরায় চাল তৈরী করা যায় না।

সুবীর চৌধুরী, কৃষ্ণ সাধুখাঁ রোড, নৈহাটি, উঃ 24 পরগনা।

এই প্রসঙ্গে আরও চিঠি লিখেছেন ঃ

শক্তিপ্রসাদ হাজরা, তপন মাজী, সৌমেন মাজী, বাঁকুড়া।

॥ মুদ্রণ-প্রমাদ ॥

পত্রিকার June '89 সংখ্যায় "কেমন করে মুক্তি পাব" রচনায় কয়েকটি অনিচ্ছাকৃত মুদ্রণ প্রমাদ ঘটেছে। সেগুলির উল্লেখ করা হল।

1. পৃষ্ঠা 15তে প্রথম কলমের 29তম লাইনে '3'-এর পরিবর্তে 'v' বেগে হবে।

2. ঐ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমের 24-তম লাইনে 'পৃথিবীর ব্যাস (R)—এর স্থলে 'পৃথিবীর ব্যাসার্ধ (R)' পড়তে হবে।

3. রচনার সর্বত্রই মুক্তিবেগকে 'VE' ছাপা হয়েছে। ঐটি হবে 'V_E'।

4. পৃষ্ঠা 16তে দ্বিতীয় লাইনে '$V_E = 11{\cdot}2$ কিমি/সেকেণ্ড'—এর পরিবর্তে $V_E = 11{\cdot}12$ কিমি/সেকেণ্ড পড়তে হবে।

5. ঐ সংখ্যারই 9 পৃষ্ঠায় 'ট্যাকিওন কি সত্যই আছে' নিবন্ধের অষ্টম লাইনে 'mo = স্থির অবস্থায় বস্তুর বেগ'—এই বাক্যের পরিবর্তে 'স্থির অবস্থায় বস্তুর ভর' পড়তে হবে।

এই মুদ্রণ প্রমাদের জন্য আমরা দুঃখিত।—**সম্পাদকীয় বিভাগ**

ভাইরাসের আবিষ্কারক

মে '89 সংখ্যায় 'চিঠিপত্র' বিভাগে জনৈক আগ্রহশীল পাঠক অক্টো + নভেঃ '88 যুগ্ম সংখ্যার 'চিঠিপত্র' বিভাগে প্রকাশিত আমার চিঠির সমালোচনা করে তা থেকে কিছু ত্রুটি উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন বিজ্ঞানী জেনার, টাকাহাসি ও বিজ্ঞানী আইভানওস্কি—এঁদের মধ্যে কেবলমাত্র বিজ্ঞানী আইভানওস্কি ভাইরাস আবিষ্কার করেন। আমার মনে হয় সমালোচক ভাইরাসের আবিষ্কারকদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবগত নন। তাঁর এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমি ভাইরাসের আবিষ্কার প্রসঙ্গে কয়েকজন বিজ্ঞানীর অবদান আলোচনা করছি ঃ

1796 খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী জেনার (Jenner) সর্বপ্রথম ভাইরাস আক্রান্ত বসন্ত রোগের কথা উল্লেখ করেন। বিজ্ঞানী আইভানওস্কি (Ivanowsky) সর্বপ্রথম তামাক গাছের ভাইরাস আক্রান্ত রোগের নির্যাস-স্বরূপ প্রতিনিধিগুলিকে অনু-পরিস্রুতির (Microfilter) সূক্ষ্ম ছিদ্রের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং ঐ সংক্রমনকারী তরলকে বা বিষকে তিনি 'সংক্রামক সজীব তরল' নামে অভিহিত করেন। 1933 খ্রীষ্টাব্দে জাপানের বিজ্ঞানী টাকাহাসি (W. N. Takahashi) সর্বপ্রথম তামাক গাছের ভাইরাস আক্রান্ত মোজেক রোগের কারণ উল্লেখ করেন এবং উপ্ত ভাইরাসের আকৃতি সম্পর্কে কিছু তথ্য প্রকাশ করেন। 1935 খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন বিজ্ঞানী W. N. Stanley তামাক গাছের টোবাকো মোজেক ভাইরাসকে রোগাক্রান্ত পাতা থেকে বিচ্ছিন্ন ও কেলাসিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। 1936 খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের বিজ্ঞানী

মশা তাড়ানোর যন্ত্র

"মার্চ 1989 কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানের নিজে নিজে কর বিভাগে প্রকাশিত আমার লিখিত "মশা তাড়ানোর যন্ত্র" মডেলটির সংশোধিত সার্কিট।

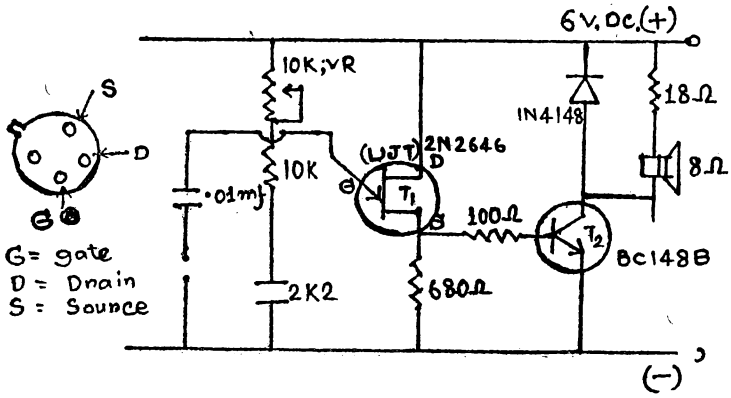

CIRCUIT DIAGRAM

Component List

T1 2N2646 Diod -1N4148

T2 BC148B

Resistance → 10KΩ, 680Ω, 100Ω, 18Ω 10K V.R (Potentiometer) Condenser → ·01mf, 2K2 Speaker 8Ω – 1pce - 4", on/off switch, Veno Bond, Wire Solder, Battery, E.T.C

শুভাশিস বিশ্বাস, বগুলা কলেজ পাড়া, বগুলা, নদীয়া

ভূমিকম্প কি ও কেন ?

গত মে '89 সংখ্যায় দিলীপ বন্দোপাধ্যায়ের "ভূমিকম্প কী ও কেন ?" নিবন্ধটিতে বলা হয়েছে যে 1950 সালের 15 আগস্ট আসামের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে যে ভীষণ ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছিল, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকম্প বিশারদদের মতে এটি পৃথিবীর পাঁচটি প্রচণ্ডতম ভূমিকম্পের একটি। রিকটার স্কেলে এই ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল 8·5। এতই প্রচণ্ড যে পৃথিবীর অনেকে এই ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পকে নানা বিশেষণে ভূষিত করেছে, যেমন ভয়ঙ্কর, প্রচণ্ড, অভূতপূর্ব ভয়াবহ ইত্যাদি। কিন্তু এই ভূমিকম্পের ভয়ঙ্করতা বা ভয়াবহতার কোন কারণ তুলে ধরা হয়নি। যেমন উল্লেখযোগ্য বিষয় যে এই ভূমিকম্পে আসামের দিবাং নদীর গতিপথ বদলে গিয়েছিল ইত্যাদি।

মহেন্দ্রলাল দাস, ফারাক্কা, ব্যারেজ, মুর্শিদাবাদ

লেখকের উত্তর —1950 সালের 15 আগস্ট আসাম ও তার আশেপাশে যে প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়। ভূপৃষ্ঠের প্লেট মুভমেন্টের ফলেই তা ঘটেছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। 'কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান'-এর পাঠকদের পক্ষে কার্যকারণের এই ধরনের জটিলতার মধ্যে এর চেয়ে বেশি যাওয়া উচিৎ নয়। তাছাড়া প্রবন্ধটি আকারে ছোট। তাই এই অল্প পরিসরের মধ্যে কোনো একটি ভূমিকম্প সম্পর্কে খুব বেশি তথ্য দিলে মূল প্রবন্ধের চরিত্র বদলে যায়।

দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা-54

ব্যাডেন (E. C. Bowden) এবং পিরী (N. W. Pirie) ভাইরাসে প্রোটিন এবং নিউক্লিক অ্যাসিডের উপস্থিতি প্রমাণ করেন। সুতরাং সমালোচকের সঙ্গে আমি কিছুতেই একমত হতে পারছি না। আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, ভাইরাস কেবল একজন বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেননি; ভাইরাস আবিষ্কারে অনেক বিজ্ঞানীরই অবদান আছে।

মহঃ ওমর আহমেদ, সৈদপুর, টাকী, উঃ 24 পরগনা।

অফুরন্ত বিদ্যুৎ সম্ভব নয়

গত ফেব্রুয়ারি 1989 সংখ্যার 'নিজে নিজে কর' বিভাগে প্রকাশিত অনিরুদ্ধ সরকার-এর মডেলটি পড়ে খুব অবাক হলাম। 'অটো পাওয়ার স্টেশন' মডেলটি পড়ে মনে হল উনি ও'নার ঐ যন্ত্রের সাহায্যে সামান্য বিদ্যুৎ শক্তি দিয়ে অফুরন্ত বিদ্যুৎ পেতে পারেন। একটু ব্যাখ্যা করা যাক। ধরা যাক ডায়নামোস্টাট করার জন্য Motor-এ Power দেওয়া হল 6V, 1amp. অর্থাৎ 6 watt. এবার Motor ঐ 6 watt শক্তিই Dynamo-কে সর্বাপেক্ষা বেশী শক্তি দিতে পারে। এবার Dynamo ঐ 6 watt শক্তিই সর্বাধিক শক্তি দিতে পারে। কিন্তু উভয়ক্ষেত্রেই সর্বাধিক শক্তি পাওয়া যাবে না, কারণ মাঝখানের ঘর্ষনবল। ফলে প্রদত্ত শক্তির চেয়ে প্রাপ্ত শক্তির পরিমান কমে যাবে। তাই বাস্তবে মডেলটি কখনই সম্ভব নয়। যদি সম্ভব হত তবে আইনস্টাইনের সেই বিখ্যাত সমীকরণ $E=Mc^2$ ও ভুল প্রমানিত হত। কারণ সেক্ষেত্রে ভরের বিলুপ্তি না ঘটেই শক্তির উদ্ভব ঘটত। তাই নয় কি ? এ বিষয়ে লেখকের মতামত জানার আগ্রহ রইল।

সৌমেন্দু বিকাশ পাত্র, চামরাইল জেলা হাওড়া।

বিশ্ব বিজ্ঞান

তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত ছাই-এর নতুন ব্যবহার

তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে যে 'ফ্লাই অ্যাশ' (fly ash) বা ছাই পাওয়া যায়, তার সঙ্গে পরিমিত 'জিপসন' সিমেন্ট মিশিয়ে একরকম টালি প্রস্তুত করেছেন 'মেরিন রিসার্চ' ল্যাবরেটরী,' U.K. এর গবেষকেরা। এই টালি খুব মজবুত এবং জল নিরোধক।

তেলাপোকা নিধনের নতুন যন্ত্র

গৃহস্থের রান্নাঘরের আনাচে-কানাচে তেলাপোকার উৎপাত প্রায় সব সংসারেই আছে। এদের মেরে ফেলার জন্যে বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই আছে। কিন্তু তেলাপোকা মারার যন্ত্র প্রথম আবিষ্কার করলেন ব্রিসবেনের এক কৃষক, নাম 'গ্রেগ জেফ্রেস'। তাঁর আবিষ্কৃত যন্ত্রটির নাম Cockroaeh Zapper. যন্ত্রটি দেখতে একটি ফাঁপা ভিডিও ক্যাসেটের মতো। তার মধ্যে তেলাপোকার ভাল লাগে এমন একটি খাদ্য, বড়ির আকারে রেখে দেওয়া হয়। খাদ্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যখনই একাধিক তেলাপোকা জড়ো হয় যন্ত্রটির মধ্যে তখনই সুইচ টিপে যন্ত্রের মধ্যে অধিক ভোল্টেজের বিদ্যুৎ চালনা করা হয়। তাতেই একসঙ্গে একাধিক তেলাপোকা মরে যায়। অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে যন্ত্রটি দারুণ বিক্রী হচ্ছে।

ভারতের মহাকাশ বিজ্ঞানী অধ্যাপক যশপাল সম্মানিত হলেন

মহাকাশ গবেষণা হতে প্রাপ্ত ফলগুলি মনুষ্য জগতে কি কি উপকারে আসে তা ব্যাপকভাবে প্রচারের স্বীকৃতি স্বরূপ "The Association of space explorers of the united states" ভারতীয় মহাকাশ বিজ্ঞানী অধ্যাপক যশপালকে পুরস্কৃত করলেন। পুরস্কার দেওয়া হবে রিয়াদ (Riyadh)-এ, এ বছরের নভেম্বর মাসে। অধ্যাপক যশপাল বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান কমিশনের চেয়ারম্যান।

অনুবাদক কমপিউটার

কমপিউটারকে দিয়ে আজকাল অনেক কাজ করানো যাচ্ছে। কিন্তু অনুবাদ? এক ভাষা থেকে অন্য পাঁচটি ভাষায় অনুবাদ এবং তাও মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে। হ্যাঁ, এও সম্ভব করেছেন জাপানের NEC Corporation. তাঁরা এই রকম অভিনব কমপিউটার যন্ত্র তৈরি করেছেন। 'Pivot Method' এ এই যন্ত্রটি তৈরি হয়েছে। বর্তমানে জাপানী ভাষা থেকে এই কমপিউটার চাইনিজ, কোরিয়ান, থাই, স্প্যানিশ ও ইংরেজী ভাষায় অনর্গল অনুবাদ করে চলেছে। প্রযুক্তি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এ এক অনবদ্য অবদান।

বিজ্ঞান সংবাদ

বিজ্ঞান আলোচনা চক্র ঃ

বিগত একুশে জুলাই, 1987 তারিখ বৈকালে খোদম বাড়ি ইউনিয়নের হাইস্কুলে মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পারমাণবিক শক্তি—সম্ভাবনা ও বিপত্তি বিষয়ের উপর ব্লক ভিত্তিক বিজ্ঞান আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। ঐ অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেছিলেন নন্দীগ্রাম—2 পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীঅশোক কুমার তুঙ্গ এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নন্দীগ্রাম—2 ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীখগেন্দ্রনাথ ধর। এই অনুষ্ঠানটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত হয়। উদ্যোক্তা ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং ভারত সরকারের বিড়লা শিল্প ও কারিগরি সংগ্রহ শালা।

ডঃ গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্যর স্মরণ সভা ঃ

পয়লা আগষ্ট, 1989 'নিউরবি' পত্রিকা প্রয়াত ডঃ গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্যের চুরানব্বইতম স্মরণ সভার আয়োজন করেছেন। ঐ অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করবেন যথাক্রমে ডঃ বীরেন্দ্র বিজয় বিশ্বাস এবং ডঃ মৃণাল কুমার দাশগুপ্ত। এই অনুষ্ঠানে দুটি তথ্য চিত্রও প্রদর্শিত হবে। প্রথমটির নাম 'গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য' এবং দ্বিতীয়টির নাম 'বিজ্ঞান ও তার আবিষ্কার।' উভয় তথ্য চিত্রই পাওয়া গেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ থেকে।

চাঁদের পর ক্ষুড়ি বছর

সমরজিৎ কর

পৃথিবীর প্রথম মানুষ নিল আর্মস্ট্রং চাঁদের বুকে অবতরণ করেছিলেন 21 জুলাই, 1969। যে যানটিতে চড়ে তিন চাঁদে যান, তার নাম অ্যাপলো-11। আর্মস্ট্রং-এর সঙ্গে ছিলেন এডুইন অলড্রিন এবং চার্লস কনরাড। অ্যাপলোর ডগায় ছিল একটি যান কলামবিয়া। তাতে চড়ে কনরাড চাঁদের আকাশে উপগ্রহের মত পরিক্রমণ করতে থাকেন। আর আর্মস্ট্রং তাঁর সঙ্গী অলড্রিনকে নিয়ে সেই যানটি থেকে আর একটি ছোট্ট যানে নেমে আসেন চাঁদের বুকে। খুদে এই যানটির নাম ছিল ঈগল।

সে এক রুদ্ধশ্বাস মুহূর্ত। পৃথিবীর সমস্ত মানুষের তখন একমাত্র লক্ষ্য চাঁদ। একমাত্র চিন্তা ; মানুষ সত্যিই কি পৃথিবীর ওই উপগ্রহটির বুকে অবতরণ করতে পারবে ? যদি পারেও, সেখান থেকে ফিরে আসতে পারবে তো ? এমন প্রশ্নও করেছিলে কেউ কেউ : এত খরচ করে মানুষ চাঁদে পাঠিয়ে কী এমন লাভ হল ?

এ সব এখন পুরনো কথা। অ্যাপলো-11-র পর আরো পাঁচটি অ্যাপলো যানে চড়ে মানুষ চাঁদে গিয়েছে। এই যানগুলি হল অ্যাপলো-12, 14, 15, 16 এবং 17। মহাকাশে যান্ত্রিক গোলযোগের দরুণ অ্যাপলো-13 কে মাঝ পথ থেকে ফিরিয়ে আনা হয়।

অ্যাপলো যাত্রীরা চাঁদের বিভিন্ন অঞ্চলে জরিপ করেছিল। সংগ্রহ করে এনেছিল বিভিন্ন অঞ্চলের পাথর এবং মাটির নমুনা। সেই পাথর এবং মাটি পরীক্ষা করে অনেক নতুন কথা জানতে পেরেছেন বিজ্ঞানীরা। জানা গেছে, চাঁদে জল নেই, বাতাস নেই। দিনের দিকে সেখানে প্রচণ্ড গরম—তাপমাত্রা 100 ডিগ্রী সেলসিয়াসেরও উপরে ওঠে। রাতে প্রচণ্ড শীত। বাতাস না থাকায় চাঁদের বুকে বর্ষণ ঘটে মহাজাগতিক রশ্মির। আয়নিত কণার। অ্যাপলোযাত্রী সেখানকার বিভিন্ন অঞ্চলে নানারকম স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র রেখে এসেছে। সেই সব যন্ত্র নিয়মিত জানিয়ে দিয়েছে সেখানকার আবহাওয়ার অবস্থা। জানা গেছে, চাঁদের সমস্ত অঞ্চলে চলছে সৌর-ঝড়ের ঝাপটা। সৌর-ঝড় সৃষ্টি করে এক ধরনের বাতাস। সেই বাতাস সৃষ্ট হয় সূর্যে। পৃথিবীর বাতাসের মূল উপাদান যেমন অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন গ্যাস, সেই সঙ্গে যৎসামান্য জলীয় বাষ্প, কার্বন ডাইঅক্সাইড, হিলিয়াম, নিয়ন প্রভৃতি গ্যাস, সৌর বাতাসের উপাদান তেমনটি নয়। সৌর বাতাসের মূল উপাদান 'প্রোটন' অর্থাৎ হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়াস। এ ছাড়াও তাতে থাকে সামান্য হিলিয়াম, তেজস্ক্রিয় রশ্মি। বিশেষ করে অতিবেগুনী রশ্মি, গামা এবং এক্স রশ্মি ; থাকে প্রচণ্ড তেজ সম্পন্ন আয়নিত কণা। যে কোন জীবের পক্ষেই তারা মারাত্মক বিপজ্জনক।

অ্যাপলো-12-র যাত্রীদের বসান একটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র। চাঁদের নিম্ন-আকাশে একবার জলীয় বাষ্পেরও সন্ধান পায়। তবে একবারই। পরে যথেষ্ট অনুসন্ধান করেও সেখানে জল পাওয়া যায় নি। তবু অ্যাপলো-12-র পাঠান খবরটি খুব উৎসাহিত করেছে বিজ্ঞানীদের। তাঁদের ধারণা, চাঁদের ভূপৃষ্ঠে জল না থাকলেও, হয়ত তার ভূস্তরের গভীরে এখনো রয়েছে। সেই জলেরই কিছু অংশ হয়ত ফাটল পথে বেরিয়ে এসে বাষ্পে পরিণত হয়। পরে তেজস্ক্রিয় রশ্মির স্পর্শে বিভাজিত হয়ে সৃষ্টি করে অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন। যা শেষ পর্যন্ত মহাকাশে বিলীন হয়ে গেছে।

সত্যি কথা বলতে কি, মানুষের চাঁদে অবতরণ করার পর এই যে কুড়িটি বছর পেরিয়ে গেল। দীর্ঘ এই সময়ে মহাকাশ গবেষণায় আরো কত ঘটনাই না ঘটেছে। চাঁদে যাওয়ার অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে মঙ্গল গ্রহের বুকে নামান হয়েছে মহাকাশযান ভাইকিং। ভয়েজার 1 এবং 2 নামে দুটি আন্তর্গ্রহযান পাঠান হয়েছে। যারা বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস এবং নেপচুন—এই গ্রহগুলি সম্পর্কে অনেক নতুন কথা জানিয়েছে। বৃহস্পতির বৃহত্তম উপগ্রহগুলির মধ্যে একটির নাই ইও (Io)। জানা গেছে, এই উপগ্রহটিতে রয়েছে জীবন্ত আগ্নেয়গিরি। যার জ্বালামুখ থেকে বেরিয়ে আসছে সালফার ডাই অক্সাইড সহ নানা রকম গ্যাস। শনির মত ইউরেনাসেরও চারপাশে রয়েছে বলয়। ভয়েজার তার

ছবি তুলে পাঠিয়েছে। জানা গেছে, শনির বুকে জমে রয়েছে মিথেনের বরফ। এ সব তথ্য গ্রহ উপগ্রহের জন্ম রহস্য জানতে সাহায্য করবে বলে মনে করেছিল বিজ্ঞানীরা।

হয়ত জিজ্ঞেস করবে, তা না হয় হল। চাঁদ নিয়ে কী করছেন বিজ্ঞানীরা?

ঠিক কথা। শুনে খুশী হবে, চাঁদের ব্যাপারেও এরই মধ্যে নানা রকম পরিকল্পনা তৈরি হয়েছে। সে সব পরিকল্পনার কথা শুনলে অবাকই হবে তোমরা।

ঠিক হয়েছে আগামী বছর কুড়ির মধ্যে চাঁদে ছোটখাট একটি শহর তৈরি করবেন বিজ্ঞানীরা। ভাবছো, শহর তো তৈরি হবে, সেখানে মানুষ বাঁচতে পারবে তো? জল বাতাস তো নেই; খাবেই বা কী?

তা হলে, শোন। তাঁদের পরিকল্পনাটির কথা বলি।

চাঁদে জল বাতাস নেই ঠিকই কিন্তু সেখানকার ভূস্তরে রয়েছে প্রচুর অক্সাইড এবং হাইড্রাইড। ঠিক হয়েছে, সেই অক্সাইড থেকে সংগ্রহ করা হবে অক্সিজেন এবং হাইড্রাইড থেকে হাইড্রোজেন। এর পর সেই অক্সিজেনের সংস্পর্শে হাইড্রোজেন পুড়িয়ে তৈরি করা হবে জলীয় বাষ্প। জলীয় বাষ্প ঘনীভূত করা তৈরি করা হবে জল। আর পোড়ানর সময় যে শক্তি উৎপন্ন হবে তা খাবার-দাবার গরম করার কাজেও লাগান যেতে পারে। আবার একই সঙ্গে বিদ্যুৎ উপাদানেও কাজে লাগান যেতে পারে।

ঠিক হয়েছে, পৃথিবী এবং চাঁদের মধ্যে তৈরি করা হবে মহাকাশ স্টেশন। স্পেশ শাটলের মত যানে চড়ে পৃথিবীর যাত্রীরা প্রথমে যাবেন এক নম্বর স্টেশনে। সেখানে বিশ্রাম করার পর যাবেন দ্বিতীয় স্টেশনে। এই ভাবে থেমে থেমে শেষ পর্যন্ত চাঁদের শহরে। এতে যানবাহন চালানর জন্যে জ্বালানি খরচ হবে কম। যাত্রীরা সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন যন্ত্রপাতি এবং সাজ-সরঞ্জাম।

চাঁদের ভূস্তরের গভীরে তৈরি করা হবে বড় বড় গহ্বর। যার ভেতর বাইরের ক্ষতিকর রশ্মি এবং কণা ঢুকবে না। সেখানে জল তৈরি হবে। কৃত্রিম উপায়ে উৎপাদন করা হবে গম, চাল, ডাল এবং শাক সবজি। খাওয়ার জন্যে কিছু কিছু প্রাণীও প্রতিপালন করা হবে। সৌর শক্তি থেকে তৈরি হবে বিদ্যুৎ। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র সংগ্রহ করবে মূল্যবান ধাতুর খনিজ সোনা, তামা, প্ল্যাটিনাম, এই সব। এই সব ধাতু ভূগর্ভের কারখানায় শোধন করে পাঠিয়ে দেওয়া হবে পৃথিবীতে। এ ছাড়াও সেখানে নানা রকম ওষুধ এবং রাসায়নিক যৌগ উপাদনের কথাও ভাবা হচ্ছে। যাদের পৃথিবীতে তৈরি করা শক্ত।

থাকবে নক্ষত্র জগৎ সম্পর্কে গবেষণার ব্যবস্থা। চাঁদ থেকে মঙ্গল গ্রহে যাতায়াতের সহজ ব্যবস্থার কথাও ভাবা হয়েছে। এতে খরচ পড়বে কম। অর্থাৎ পৃথিবীর মানুষের স্বার্থেই কাজে লাগান হবে চাঁদকে। এ সব যখন অনেকের কাছে গল্প বলে মনে হলেও, বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস, আগামী কুড়ি-তিরিশ বছরের মধ্যে আর গল্প থাকবে না। মানুষের নিয়মিত চাঁদে যাতায়াত তখন তোমরাও অনেকে হয়ত দেখতে পাবে।

বিশিষ্ট বিজ্ঞান লেখক

সমরজিৎ করের

নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী

তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে ॥ দাম ২৫·০০

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ● ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কল-৯

আলো নিয়ে সমস্যা

রাহুল রায়

কেউ তোমাকে জিজ্ঞেস করল আলোর গতিবেগ কত ? তুমি মাথা না চুলকেই সরাসরি বললে 3×10^{10}cm/Sec.। প্রশ্ন কর্তা বললেন—এবার বলতো আলো দু' সেকেণ্ডে কতদূর যায়। তুমি ভাবছ—এতো খুব সহজ প্রশ্ন। ভাববার অবকাশ না দিয়েই প্রশ্নকর্তা দেঁতো হাসি হেসে বললেন—"3×10^{10} cm"। "কি খুব অবাক হয়ে গেলে ?" প্রশ্নকর্তা বইয়ের টেবিল থেকে একটা কাগজ টানলেন—"তা হলে প্রমাণ করেই দিই কি বলো মিস্টার ?" হ্যাঁ সেই প্রমাণটাই আমি তুলে দিলাম—ভুল ধরতে পারলে খুব খুশী হব। তার আগে বলে নেই আমি কিন্তু এর ভুল ধরতে পারি নি।

আলোর গতিবেগ $=v=3\times10^{10}$ cm/Second ঋজু গতি সম্পর্কীয় সমীকরণ থেকে আমরা পাই $v=u+ft$

[যখন $u=$ প্রাথমিক বেগ, f বস্তুকণার ত্বরণ এবং $t=$ সময়]

$\therefore\quad 3\times10^{10}=0+f\cdot1$ [আলোর প্রাথমিক বেগ $=0$]

$f=3\times10^{10}$

$\therefore$ আলোকের ত্বরণ $=3\times10^{10}$ cm/Second^2.

ঋজু গতি সম্পর্কীয় সমীকরণ থেকে আমরা আরেকটি সূত্র পাই, সেটি হল, $S=u+ +\frac{1}{2}ft^2$

[যখন $S=$ অতিক্রান্ত দূরত্ব]

এবার দেখা যাক্ 2 সেকেণ্ডে আলো কতদূর যেতে পারে।

$S=ut+\frac{1}{2}ft^2$

এখানে $S=0\cdot2+\frac{1}{2}.\ 3\times10^{10}.\ 2$

$(=)\ S=3\times10^{10}.$

$\therefore$ আলো কর্তৃক দু সেকেণ্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব ও $=3\times10^{10}$ cm.

"কি এবার বুঝলে তো ?"—প্রশ্নকর্তা ফিক করে হেসে জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম—"মানে...." তাকিয়ে দেখি প্রশ্নকর্তা উধাও। বড্ড বিপদে পড়ে গেলাম। মনে হয়, সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা ছাড়া কেউ আমাকে উদ্ধার করতে পারবেন না। সাহস করে এগিয়ে এসে আমাকে উদ্ধার করুন নইলে যে 'রহস্যাগারে' ডুবে মরব !

রায়পাড়া, কৃষ্ণনগর।

মে'89 সংখ্যায় আমার লেখা "বিশেষ ত্রিভুজের এক নতুন ধর্ম"—আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে দেখে খুব উৎসাহিত হয়েছি। তবে লেখাটায় কিছু ছাপার ভুল আমার চোখে পড়ল। মূল সূত্রের দু'টো অনুসিদ্ধান্ত ছাপা হয়েছে—

(1) $b^2=\dfrac{2a^2+c^2\pm c\sqrt{c^2+8a^2}}{2}$

(2) $a^2=\dfrac{2b^2+c^2\pm c\sqrt{c^2+8b^2}}{2}$

এর স্থলে হবে—

(1) $b^2=\dfrac{2a^2+c^2\pm c\sqrt{c^2+8a^2}}{2}$

(2) $a^2=\dfrac{2b^2+c^2\pm c\sqrt{c^2+8b^2}}{2}$

কুমারহাট, বারুইপুর, 24 পরগণা (দঃ)

বিতর্ক

বিতর্কের পাতা—কিশোর মনের বিচিত্র ভাবনা চিন্তার প্রতিফলন।
যুক্তিগ্রাহ্য যে কোন বিজ্ঞান রচনা 'বিতর্ক' বিভাগে
আলোচনার জন্য পাঠানো যেতে পারে।

"ট্যাকিওন বিতর্ক"

সৌমিত দাস

"ট্যাকিওন কি সত্যিই আছে ?" এই বিতর্কে রাহুল রায় (জুন, '৮৯) আমার স্বপক্ষেই রায় দিয়েছেন। এজন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। তবে সেই সঙ্গে তিনি আমার লেখায় (এপ্রিল, '৮৯, কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান) আইনস্টাইন-বিরোধীতার কথা বলেছেন। আমি প্রথমেই জানিয়ে রাখি যে, আমার নিবন্ধের উদ্দেশ্য 'আইনস্টাইন বিরোধীতা' করা ছিল না, ছিল ট্যাকিওনের অস্তিত্ব আছে কি নেই তা নিয়ে বলা। তবে প্রাসঙ্গিকভাবেই আইনস্টাইনের তত্ত্ব এসে পড়ে।

শ্রীরায় লিখেছেন যে, আলোকের চেয়ে কোন দ্রুতগামী কণা সময়ের বিপরীতে যেতে পারে না। আমার লেখাতে এর সম্পূর্ণ উল্টো কথা লেখা ছিল। আসলে আইনস্টাইনের তত্ত্বে আমরা দেশ—কালের যে রূপ দেখি, ট্যাকিওনের অস্তিত্ব সেই দেশ—কালের সাহায্যে বোঝা সম্ভব নয়। এর কারণ ট্যাকিওন জন্ম থেকেই আলোর চেয়ে দ্রুতগামী। তাই অবাস্তব মনে হলেও ট্যাকিওন সময়ের বিপরীত দিকে যাবে। এর জন্য প্রয়োজনীয় উদাহরণ আমার লেখাতেই রয়েছে। যেমন আর একটি উদাহরণ, কোন জাহাজ ধরা যাক দুর্ঘটনায় পড়ল, তাতে গোটা জাহাজটা ধ্বংস হয়ে গেল এবং শত শত ব্যক্তি মারা গেল। এখন যদি এই জাহাজের ক্ষেত্রে ট্যাকিওনের প্রয়োগ ঘটানো যায়, তবে জাহাজটি সময়ের বিপরীতে একদিন আগে গিয়ে দুর্ঘটনা এড়াতে পারবে এবং অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্যি, মৃতব্যক্তিরাও প্রাণ ফিরে পাবে (কারণ দুর্ঘটনার এক দিন আগে তারা জীবিত ছিল)।

আমি কিন্তু বলতে চাইছি না যে, ট্যাকিওনের সাহায্যে এই পৃথিবী বা বিশ্ব জগতের দেশ-কালের অবস্থাকে বদলে দেওয়া যাবে। শুধু কোন নির্দিষ্ট বস্তু এর সাহায্যে সময়ের বিপরীতে যেতে পারে। অর্থাৎ দুর্ঘটনাগ্রস্ত জাহাজে ট্যাকিওনের প্রয়োগ করলে এই পৃথিবীর সময় এক দিন আগে যাবে না, যাবে শুধু জাহাজটির সময়। সমগ্র পৃথিবীর সময় বদলে যাওয়াটা একটা অসম্ভব ব্যাপারই।

ঋণাত্মক শক্তি :—বিজ্ঞানীদের ধারণা, ট্যাকিওন-এর শক্তি 'ঋণাত্মক' এবং ভর 'কাল্পনিক'। কারণ আলোর চেয়ে বেশী গতিবেগ নিয়ে চললেও শক্তি ঋণাত্মক হয়ে যাবে। আর ঋণাত্মক শক্তির ধারণাটি সময়ের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে বিবাদের সৃষ্টি করবে।

আইনস্টাইনের নিয়মের সাহায্যে বিশ্বকে সরল ও সংহত রাখা হচ্ছে। কিন্তু ট্যাকিওনের আবিষ্কার বিশ্বের এই সংহত রূপের ধারণাকে নষ্ট করে দিতে পারে।

আর সমস্ত তর্ক-বিতর্কের এবং বাদানুবাদের অবসান একমাত্র ঘটাতে পারে ট্যাকিওনের আবিষ্কার। আমরা সেই দিনের প্রতীক্ষায় সাগ্রহে চেয়ে থাকি।

চকভবানী, বালুরঘাট।

সংখ্যা 1 কি মৌলিক না যৌগিক ?

উপরোক্ত শিরোনামে বিতর্কের আহ্বান জানিয়ে দপ্তরে চিঠিপত্র এসেছে। এ সম্পর্কে যুক্তিসহ পাঠকের অভিমত কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান এর পাতায় প্রকাশের জন্য আহ্বান করা হচ্ছে।

এ পর্যন্ত প্রকাশিত বিতর্ক

বিতর্ক 1 : ট্যাকিওন কি সত্যিই আছে ?
বিতর্ক 2 : বিশেষ ত্রিভুজের নতুন ধর্ম।
বিতর্ক 3 : একটি কোণকে কি সমান সংখ্যক কোণে বিভক্ত করা সম্ভব ?

চৈতি-ফাগুন ফুল

অশোক-মাদার-পলাশ-শিমুল

বাপ্পাদিত্য রায়চৌধুরি

ছেলেবেলায় একবার দোল উৎসবে গিয়েছিলাম গাঁয়ে। গিয়ে পৌঁছেছি সকালে। উঠেছি এক দাদুর বাড়ী। খানিক বাদে দেখি গাঁয়ের কুচোকাচার দল, বিরাট এক গামছা বাঁধা পেটলা নিয়ে হাজির। কচি গলায় তাদের দাবী মালা গড়ে দিতে হবে। ফুলের মালা। তাই পরে ওরা রং খেলবে। যার উদ্দেশ্যে এই আহ্বান সেই ভুলদাদু, দাওয়ায় পাতা চৌকিতে বসতেই গামছার বাঁধন খোলা হল। নিমেষে একখানা লাল বেনারসী যেন বেউ ছড়িয়ে দিল। চৌকি জুড়ে অজস্র লাল ফুল। সিঁদুরে লাল, উজ্জ্বল কমলা, ফিকে লাল, আর গাঢ় লাল। অবাক করা সে লাল দেখে আমিও অবাক। প্রকৃতির কি বিচিত্র শখ! এই চৈত্র ফাল্গুনে আকাশ যখন রেশমী নীল, বাতাসে আমের বোলের গন্ধ, শুক্‌নো পাতার ছুটোছুটি সকাল থেকে সন্ধ্যে ঠিক তখনই মরা ডালের মাথায় মাথায় প্রাণের আবির্ভাব। যার শুরু লালে হলুদে। প্রতিটি গাছে একই রং। আগুনরঙা ফুলে সেজে সবাই যেন বলছে—

"আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে,
এ জীবন পুণ্য করো।"

প্রকৃতির পাতা ঝরা রিক্ত বুকে, এ সময় ফোটে অশোক, মাদার, পলাশ আর শিমুল। পাঠক মাত্র লক্ষ্য করে থাকবেন, এই চারটি ফুলের রং প্রায় একই। আর এই চারিটি ফুল প্রায় প্রত্যেকেই দেখেছেন। তবে দেখা আর চেনার মধ্যে বিস্তর তফাৎ। এ লেখায় তাই চিনবার এবং চেনাবার চেষ্টাই করা হয়েছে

অশোক

অশোক গাছে বৈশাখ থেকে ফুল ফোটা শুরু হয়ে চলবে জৈষ্ঠের শেষ পর্যন্ত। শিম্ব বর্গের উদ্ভিদ অশোক (সারাকা ইণ্ডিকা) মতান্তরে (জোনেসিয়া আশোকা) ভারতের সহজাত বৃক্ষ। সারাকা শব্দটি দক্ষিণ ভারতীয় কোন আদিবাসী শব্দ বলে অনুমান করা হয়, ইণ্ডিকা অর্থাৎ যা ভারতীয়। পরবর্তীকালে প্রখ্যাত ব্রিটিশ পণ্ডিত স্যার ইউলিয়স্ জোন্সের সম্মানে অশোকের নামকরণ করা হয় জোনেনিয়া অশোকা। প্রাচীন ভারতে অশোক একটি সুপরিচিত ও পবিত্র বৃক্ষ বলে সমাদৃত হয়ে এসেছে। সাহিত্যে, উৎসবে, ভাস্কর্যে, অথবা ভেষজ চিকিৎসায় অশোক ফুল এবং গাছের ব্যবহার ও উল্লেখ একাধিক সূত্রে পাওয়া যায়।

অশোক গাছ সাধারণত 45/50 ফুট উচ্চতার হয়ে থাকে। ছায়ান্ধকার আর্দ্রমাটি অশোকের বিশেষ প্রিয়। এই আর্দ্রতা প্রীতির জন্যেই একে বেশী করে চোখে পড়বে, পূর্বভারতের পাহাড়ী অঞ্চলে, চট্টগ্রামে, পশ্চিম ভারত ও দাক্ষিণাত্যের বৃষ্টিভেজা পাহাড়ে এবং আন্দামান, নিকেবার দ্বীপপুঞ্জে। বৌদ্ধরা এটিকে অত্যন্ত পবিত্র মনে করে। বর্মাসহ সমগ্র দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া জুড়ে প্রতিটি বৌদ্ধমন্দিরে আছে একাধিক অশোক গাছ। ভারতীয় অশোক ছাড়াও পৃথিবীতে প্রায় 15/16 প্রজাতির অশোক আছে। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার গ্রীষ্ম প্রধান অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে এই প্রজাতিরা।

অশোক চিরহরিৎ বৃক্ষ। ঘন বাদামী, বা ধূসর বাদামী মসৃণ বৃক্ষ-কাণ্ড। পাতা যৌগপত্র। প্রতিটি পাতা প্রায় ১ ফুট লম্বা। পত্রাণু তিন থেকে সাত জোড়া সবসময়ই জোড় সংখ্যায়। প্রতিটি পত্রাণু প্রায় 6 ইঞ্চি দীর্ঘ। কচি পাতা-লালচে তামাটে থেকে ক্রমশঃ কচি সবুজ ও কালচে সবুজে পরিণত হয়। পাতার রং বদল চলতে থাকে খুব ধীরে, তাই গাছে সবসময়ই তিন রংয়ের পাতা এক অপূর্ব সৌন্দর্য সৃষ্টি করে রাখে। গাছের পাতা সর্বদাই অধোমুখী যা এর সৌন্দর্যের অন্যতম কারণ। অশোক ফুলের রং প্রথমে কমলা ও পরে শুকিয়ে হয় গাঢ় লাল। ফুলে বৃতি অনুপস্থিত যা আদতে ফুলের সাথে গুচ্ছাকৃতি লাল কমলা ফুল এবং শুধু মাত্র ডালের কুক্ষি থেকে নয়। মূলকাণ্ড থেকেও নাগকেশরের মত অশোক ফুল বার হয়। ঘন সবুজ পাতার মাঝে উজ্জ্বল কমলা ফুল একবার চোখে পড়লে সহজে ভুলবার নয়। প্রতিটি ফুলে থাকে 6/8টি পুংকেশর যার দৈর্ঘ্য প্রায় 1 ইঞ্চি। বৈশাখ জৈষ্ঠে ফুল শেষে আসে ফল। মোটাসোটা তেঁতুলের মত লালচে বাদামী অশোক ফল। এক একটি ফলে থাকে 6/8টি করে বীজ। সীমের মত বড় বীজটির আবরন যেন বার্নিশ করা,, রং—কালচে লাল বা কালো। কালবৈশাখীতে এই ফল ভূপাতিত হলে বর্ষার প্রারম্ভে দেখা যাবে নতুন রংশ ধরদের। বীজ থেকে সহজেই চারা হয়। কলকাতায় আরও অশোক গাছ লাগানো উচিৎ।

আগ্রহী পাঠক শহর কলকাতায় অশোক গাছ দেখতে পাবেন—জাতীয় গ্রন্থাগারের বাগানে, দক্ষিণে বালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছে এম্ জি রুংগ্‌টা স্কুলের প্রাঙ্গণে, গড়িয়ায় পাটুলী উপনগরীতে ঢুকবার মুখে (54নং বাস স্ট্যাণ্ডের বিপরীতে) ডানদিকে, এবং গড়িয়াহাটে নবাব স্ন্যাকবারের পাশের বাড়ীতে যা সহজেই রাস্তা থেকে দেখা যাবে।

অশোক (সারাকা ইণ্ডিকা)

মাদার

মাদার, রক্ত মাদর, বা পালুতে মাদার গ্রাম বাংলার এক ঘরোয়া গাছ। যদিও 'কালিদাসের রচনায় মন্দার পুষ্প নামে এটি একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে, তবু অস্বীকার করা যাবে না বাংলার গ্রামে মাদার গাছ একটি নিতান্তই আটপৌরে নাম। ডাল পুঁতলেই গাছ আর গরু ছাগলের অপ্রিয় বলে গ্রামে মাদার গাছের বেড়া দেওয়া হয়। শহর কলকাতাতেও প্রচুর মাদার চোখে পড়বে, তবে তার নজর কাড়া রূপ দেখতে হলে অপেক্ষা করতে হবে মাঘ ফাল্গুন পর্যন্ত। নেড়া ডালে প্রবাল রঙা ফুলের উদ্ধত স্তবক দেখে অজান্তে মনে পড়বে—"কাল ছিল ডাল খালি, আজ ফুলে যায় ভরে ?"

ইংরেজীতে কোরাল ট্রি" মাদার (এরিথ্রিনাইণ্ডিকা), ভারতে সর্বত্র, বিশেষতঃ বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ, হিমালয় সন্নিহিত রাজ্যসমূহ, দক্ষিণ ভারত আন্দামান নিকোবরে প্রচুর পরিমানে দেখা যায়। এ ছাড়াও বর্মা, জাভা, সুমাত্রা, এমনকি শ্রীলঙ্কাতেও এটি পাড়ি দিয়েছে বহুকাল আগেই। মূল গ্রীক শব্দ এরিথ্রোস অর্থাৎ লাল রং থেকে এরিথ্রিনার উৎপত্তি। ইণ্ডিকা এর বিশুদ্ধ ভারতীয়ত্বের প্রতি ইঙ্গিত। সবশুদ্ধ প্রায় ৪ জাতের মাদার আছে। যদিও, পশ্চিমবঙ্গে দেখা যায় মাত্র 3টি প্রজাতি। গাঢ় লাল, সাদা এবং নিষ্প্রভ লাল। অশোকের মত মাদার শিম্বগোত্রীয় উদ্ভিদ। বাংলার তুলনায় দক্ষিণ-ভারত মাদারকে কাজে লাগিয়েছে বেশী। কাগজশিল্প ও হাল্কা আসবাব তৈরীতে মাদারের চাহিদা সেখানে বেড়েই চলেছে। মাদার গাছ কমবেশী 30/35 ফুট উঁচু হয়। ফিকে বাদামী বা ধূসর বাদামী কাণ্ড শক্ত কালো অজস্র কাঁটায় ভর্তি। বেলের মত মাদারও ত্রিপত্রী যৌগপত্রের গাছ। প্রতিটি পত্রাণু পাকুর পাতার মত তবে সামান্য গোলাকার। মাদার পর্ণমোচী বৃক্ষ। শীতের শেষে পাতা ঝরে, গাছে আসে অজস্র লাল ফুল। প্রতিটি ডাল থেকে বার হয় মাটির সমান্তরাল তিন চারটি বোঁটা। প্রতিটি বোঁটার শেষ প্রান্ত সম্মিলিত ভাবে একটি নির্দিষ্ট স্থান থেকে বার হয়। বোঁটার মাথায় ঠাসা স্তবক। এক একটি স্তবক 12/15 ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হতে দেখেছি। পাঁচ পাপড়ির ফুলে পুংকেশরগুলি কুঁড়ি অবস্থাতেই দেখা যেতে থাকে।

মাদার (এরিথ্রিনা ইণ্ডিকা)

ফুলের শেষে বরবটির মত 7/19টি বীজের প্রায় ৪ইঞ্চি লম্বা ফল প্রকাশিত হয়। ফলের শেষ প্রান্ত বাঁকানো, এবং প্রতিটি বীজের মধ্যে একটি করে খাঁচা থাকে। দূর থেকে দেখে মনে হয় বুঝি কোন অপার্থিব অতিকায় গাঁটওয়ালা আঙ্গুল। বীজ থেকে গাছ হলেও ডাল পুঁতবার রেওয়াজই বেশী। এতে গাছের বৃদ্ধিও হয় তাড়াতাড়ি এবং বহু চারা একসঙ্গে পাওয়া যায়। ট্রেনে ডায়মণ্ডহারবার যাওয়ার পথে চোখে পড়বে প্রতিটি স্টেশনের গায়ে অসংখ্য মাদার গাছ যা এখন ফুলে ফুলে লাল।

পলাশ

ইংরেজরা নাম দিয়েছিল "ফ্লেম অফদি ফরেস্ট"। সার্থক সে নামকরণ। মাঘের শেষে পালাশ ফুটলে মনে হয় সত্যিই যেন গাছে কেউ আগুন আগুন জ্বেলে দিয়েছে। গাঁয়ে গঞ্জে পলাশ দেখা গেলেও কলকাতায় যত্রতত্র পলাশ দেখা যায় না। এ শহরে পলাশ দেখতে হলে যেতে হবে রবীন্দ্রসরোবরে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে, অথবা বসু বিজ্ঞান মন্দিরের প্রাঙ্গনে এবং বিধানসভার বাগানে। বিধাননগরেও বেশ কিছু পলাশ লাগানো হয়েছে যার মধ্যে কয়েকটি শ্বেত ও পীত পলাশ।

ভারতের সহজাত বৃক্ষ পলাশ (বিউটিয়া ফ্রণ্ডোসা) মতান্তরে (বিউটিয়া মনোস্পর্মা) শিম্ব বর্গের উদ্ভিদ। উদ্ভিদ বিশেষজ্ঞ জন স্টুয়ার্ট 'আর্ল অফ বিউট' এর সম্মানে নাম করণ হয় বিউটিয়া, এবং ফ্রণ্ডোসার অর্থ পত্রবহুল। অপর নামের শোষাংশটিও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ, মনোস্পার্মা (একটি মাত্র বীজ যাহার) পলাশের ফলে একটি বীজের প্রতি ইঙ্গিত। হিমালয়ের পাদদেশ থেকে দক্ষিণে কন্যাকুমারী, পশ্চিমে মহারাষ্ট্র থেকে অবিভক্ত ভারতের পূর্বতম প্রদেশ চট্টগ্রাম বর্মা পর্যন্ত এর বিস্তৃতি। দ্বীপরাষ্ট্র শ্রীলঙ্কা এবং ভারতের ভান্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জেও ছড়িয়ে আছে একাধিক প্রজাতির পলাশ। এ রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলে অপেক্ষাকৃত খরা প্রবল বাঁকুড়া বীরভূমে বিশুদ্ধ পলাশ বন এখনও চোখে পড়ে। সম্প্রতি শান্তিনিকেতন থাকাকালীন চোখে পড়েছে উজ্জ্বল বাসন্তী ও সাদা পলাশ।

পলাশ (বিউটিয়া মনোশর্মা)

মাঝারি গড়নের গাছ—পলাশ, বাদামী—ধূসর অপরিচ্ছন্ন থাকলে চাকা পলাশ গাছ কিছুটা এঁকেবেঁকে ওঠে। পলাশের পাতাও মাদারের মতই যৌগপত্র। ত্রিপত্রী পলাশ পাতা সামান্য গোলাকৃতি অশ্বত্থ পাতার মতন। পাতার রং প্রথমে কচি ও পরে গাঢ় সবুজ। কচি পাতায় থাকে রাপালি সাদা রোঁয়া পরিনামে পরবর্ত্তীকালে পাতার ওপর ভাগ হয় খস্‌খসে। পৌষ মাসে পলাশের পাতা ঝড়ার বেলা, আর মাঘ ফাল্গুন শুরু হতেই ফুল ফোটার পালা। সাদা রেশমী লোমে ঢাকা পাঁচ পাপড়ির ফুল সামান্য লম্বা হয়ে বেঁকে গেছে যেন টিয়াপাখির ঠোঁট।

সংস্কৃতে পদাশের নাম কেন কিংশুক (কিম্ + শুক অর্থাৎ শুক কি ?) হল তা সহজেই অনুমের। ফুলের নিচে চনরম লোমশ কালচে খয়েরী বৃতি। পরবর্ত্তীকালে এ থেকেই পলাশ ফলের জন্ম। ফুল থাকা কালীন গাছ পত্রহীন, যদিও ফল জন্মানর মুহূর্ত্ত থেকেই শুরু হয় নতুন পাতার আবির্ভাব। ফল প্রথমাবস্থায় জলপাই সবুজ বড় সীমের মত, ক্রমশঃ শুকিয়ে বাদামী রেঁয়া ওঠা চেহারা নেয়। গরম হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়া ফল থেকে চারা ওঠে বর্ষার শুরুতেই।

শিমুল

অশোক মাদার আর পলাশের সাথে পাল্লা দিয়ে আরও একটি ফুল ফুটছে। এবং গর্ব করেই বলা যায়, শহর কলকাতায় সংখ্যাধিক্যে এরাই বৃহত্তম। হ্যাঁ! শিমুলের কথাই বলছি। এমন আকাশ ছোঁয়া গাছ আর হৃষ্টপুষ্ট ফুল খুব কমই দেখা যায়। শিমুল তুলার সুবাদে শিমুল নামটি আজ কারও অজানা নয়।

শিমুল বা শাল্মলী ভারতের সহজাত বৃক্ষ হলেও সমগ্র দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া জুড়ে আজ শিমুল চাষ হচ্ছে। উদ্ভিদ বিজ্ঞানে শিমুলের পরিচয় 'বমব্যাক্স মালাবারিকাম্' নাল। নামকরণ প্রয়োজনে প্রথম শিমুল আনা হয়েছিল মালাবার থেকে; তাই আজও মালাবারের নামটি সে বহন করে চলেছে। ইদানীং অবশ্য বোটানিক্যাল সার্ভে থেকে—'শাল্মলিয়া মালাবারিকাম্' নামটির ব্যবহার শুরু হয়েছে।

উচ্চতায় শিমুলের সাথে পাল্লা দিতে পারে এমন গাছ খুব কমই আছে। শহীদ মিনারের মত উঁচু গাছও নেপালের পাদদেশে দেখেছি। শিমুল গাছ বীজ ও ডাল থেকে সহজেই হয়। মাটি নিয়ে এর তেমন মাথা ব্যথা নেই, এবং আত্মরক্ষার উপায়টিও বেশ কার্যকর। দীর্ঘ ঋজু কাণ্ড গোড়া থেকে প্রায় 6/7 ফুট কাঁটায় ঢাকা। ফিকে বাদামী কাণ্ডের ওপর শক্ত কালো কাঁটা দুর থেকেও চোখে পড়ে। গোড়া থেকে খানিক উঠেই ছাতার শিকের মত তিনদিকে তিনটে (কখনো চারটে) ভূমির সমান্তরাল সোজা ডাল বেড়িয়ে আসে। এবং একইভাবে হাত দুয়েক পর পর ডাল বার হতে থাকে। প্রতিটি ডাল থেকে বার হয় দীর্ঘ অজস্র বোঁটা। বোঁটার শেষ প্রান্ত থেকে সম্মিলিত ভাবে বেড়িয়ে আসে সাত, নয় বা পাঁচটি পত্রাণু। অর্থাৎ এটিও যৌগপত্র। প্রতিটি পত্রাণু 4/4 ইঞ্চি দীর্ঘ এবং বর্শার ফলার আকারের পাতা চৈত্রে—উজ্জ্বল কচি সবুজ, ও বর্ষায় ঘন কালচে শ্যাওলা সবুজ,। ফুল গাঢ় লাল কমলা সাদা গোলাপী। প্রতিটি ফুলে পাঁচটি সমান আকারের মাংসল নরম পাপড়ি। অভ্যন্তরে হাল্কা হলুদ গর্ভদণ্ডটিকে ঘিরে ৫৯/৬০টি গুচ্ছাকৃতি পুং কেশর। বৃতিটি সবুজ মাংসল এবং তিনটি পাপড়ি যুক্ত যা—খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ফুল ফুটলে গাছে

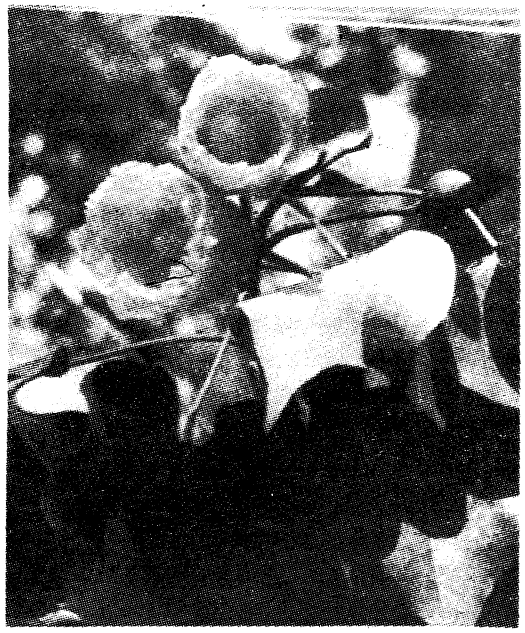

থাকে প্রায় ৩/৪ দিন। বৃতির নিম্নাংশ থেকে জন্মায় ফল পটলের মত, রোঁয়া ঢাকা বাদামী সবুজ ফল, কালবৈশাখীর হাওয়ায় ফেটে শিমুল তুলো বীজসহ জড়িয়ে দেয়। প্রতিটি ফলের ২০/৪০টি বীজ উড়ে যায় নতুন বাসস্থানের সন্ধানে

শিমুল গাছ বুড়ো হতে শুরু করলে, তার শেকড়গুলি ক্রমশঃ মাটির উপর চেপ্টা উঁচু হয়ে উঠতে থাকে। তুলো ছাড়াও এর আর একটি প্রয়োজন—দেশলাই শিল্পে কাঠের জন্য।

শহর কলকাতায় শিমুল দেখা যাবে খোদ গড়িয়াহাটার রোডে বাটার দোকানের পাশে, রবীন্দ্র সরোবরে, সার্কুলার রোডে সেনাবাহিনর স্কুল ও প্রশিক্ষণ শিবিরে, ময়দানে, উত্তর কলকাতায় বিদ্যাসাগর স্ট্রীটে এবং যাদবপুর গড়িয়া অঞ্চলে রাস্তরে ধারে। আগ্রহী পাঠক ফুল দেখে মুগ্ধ হলেও গাছে ওঠার চেষ্টা করবেন না যেন—কারণ শিমুল কাঁটার খোঁচা, এক জীবনে ভুলাবর নয়।

পলাশ-পিপুলের ভেষজ গুণ

ফল ও ফুল থেকে হলুদ রঞ্জক পাওয়া যায়। এছাড়া ছাল ও কাঠ থেকে ট্যানিন পাওয়া যায়। কাণ্ড থেকে যে কাঠ পাওয়া যায় তা থেকে নৌকা, গরুর গাড়ীর চাকা কাঠের আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি প্রস্তুত হয়।

এই উদ্ভিদটির ভেষজগুণও বর্তমান। বিশেষতঃ ফলের মধ্যে যে হলুদ রঙের রস থাকে—তা পাঁচড়া এবং ত্বকের রোগে বহিঃপ্রয়োগ হয়। ক্ষত ও ফোলায় পুলটিশ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। মূল টনিক হিসাবে প্রয়োগ হয়।

এই উদ্ভিদটির বংশ বিস্তার বীজ দ্বারা হয়। এবং ডাল কেটে পুঁতলে হয়।

—এণাক্ষী বিশ্বাস

ভগ্নাংশের ল.সা.গু. এবং গ.সা.গু. প্রসঙ্গে

অসীম মুখোপাধ্যায়

লব ও হরের ল. সা. গু. এবং গ. সা. গু.-র মাধ্যমে ভগ্নাংশের ল. সা. গু. এবং গ সা. গু. নির্ণয়ের পদ্ধতি পাটীগণিতে আছে। এই পদ্ধতি সম্পর্কে এই নিবন্ধে আলোচনা করা হবে। এর আগে ভগ্নাংশের দুটি সাধারণ প্রতিজ্ঞা উপস্থাপন করা হবে।

প্রতিজ্ঞা 1 কোনো ভগ্নাংশের লব ও হরের যদি একাধিক সম্ভাব্য মান থাকে এবং লবগুলির মধ্যে লঘিষ্ঠ এবং হরগুলির মধ্যে গরিষ্ঠ মান দুটি নিয়ে যদি কোনো ভগ্নাংশের লব ও হর গঠিত হয়, তাহলে সেই ভগ্নাংশটি সকল সম্ভাব্য ভগ্নাংশগুলির মধ্যে ক্ষুদ্রতম হবে।

প্রমাণ ঃ মনে করি ভগ্নাংশের লবের সম্ভাব্য মান সমূহের মধ্যে লঘিষ্ঠ মান ল ; অতএব ল ≤ লবের প্রতিটি সম্ভাব্য মান।

আবার মনে করি হরের সম্ভাব্য মান সমূহের মধ্যে গরিষ্ঠ মান গ, অর্থাৎ হরের প্রতিটি সম্ভাব্য মান ≤ গ।

উপরোক্ত সম্পর্ক দুটি গুণ করলে পাওয়া যাবে,

ল × হরের যে কোনো সম্ভাব্য মান ≤ লবের যে কোনো সম্ভাব্য মান × গ বা, ল/গ ≤ লবের যে কোনো সম্ভাব্য মান / হরের যে কোনো সম্ভাব্য মান,

সুতরাং, ল/গ ভগ্নাংশটি সকল সম্ভাব্য ভগ্নাংশের মধ্যে ক্ষুদ্রতম।

প্রতিজ্ঞা 2. কোনো ভগ্নাংশের লব ও হরের যদি একাধিক সম্ভাব্য মান থাকে এবং লবগুলির মধ্যে গরিষ্ঠ এবং হরগুলির মধ্যে লঘিষ্ঠ মান দুটি নিয়ে যদি কোনো ভগ্নাংশের লব ও হর গঠিত হয়, তাহলে সেই ভগ্নাংশটি সকল সম্ভাব্য ভগ্নাংশগুলির মধ্যে বৃহত্তম হবে।

প্রমাণ ঃ মনে করি ভগ্নাংশের লবের সম্ভাব্য মান সমূহের মধ্যে গরিষ্ঠ মান গ ; অর্থাৎ লবের প্রতিটি সম্ভাব্য মান ≤ গ, আবার মনে করি হরের সম্ভাব্য মান সমূহের মধ্যে লঘিষ্ঠ মান ল, অতএব ল ≤ হরের প্রতিটি সম্ভাব্য মান।

উপরোক্ত সম্পর্ক দুটি গুণ করলে পাওয়া যাবে, লবের প্রতিটি সম্ভাব্য মান × ল ≤ গ × হরের প্রতিটি সম্ভাব্য মান, বা, লবের যে কোনো সম্ভাব্য মান / হরের যে কোনো সম্ভাব্য মান ≤ গ / ল,

সুতরাং, গ / ল ভগ্নাংশটি সকল সম্ভাব্য ভগ্নাংশের মধ্যে বৃহত্তম।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে পাটীগণিতে ভগ্নাংশের ল সা. গু. নির্ণয়ের সাধারণ বা প্রচলিত পদ্ধতি পরিবেশিত হবে।

মনে করি আলোচ্য ভগ্নাংশগুলি ক/চ, খ/ছ, গ/জ,... ইত্যাদি, যেখানে প্রতিটি ভগ্নাংশের লব ও হর পরস্পর মৌলিক অর্থাৎ এদের মধ্যে কোনো সাধারণ উৎপাদক নেই। এদের ল. সা. গু. এমন একটি সংখ্যা প/ফ (অখণ্ড বা ভগ্নাংশ) হবে যেটি প্রতিটি ভগ্নাংশ দ্বারা বিভাজ্য হবে এবং এর থেকে ছোট কোনো সংখ্যা থাকবে না যেটি ঐ ভগ্নাংশগুলি দ্বারা বিভাজ্য হবে, অর্থাৎ

$$\frac{\text{প}}{\text{ফ}} \div \frac{\text{ক}}{\text{চ}} = \frac{\text{প}}{\text{ফ}} \times \frac{\text{চ}}{\text{ক}},\ \frac{\text{প}}{\text{ফ}} \div \frac{\text{খ}}{\text{ছ}} = \frac{\text{প}}{\text{ফ}} \div \frac{\text{ক}}{\text{চ}} = \frac{\text{প}}{\text{ফ}} \times \frac{\text{ছ}}{\text{খ}}, \cdots$$

ইত্যাদি প্রতিটি সংখ্যা অখণ্ড হবে এবং প/ফ সংখ্যাটি উপরোক্ত শর্তাধীনে ক্ষুদ্রতম হবে।

এখন প যদি ক, খ, গ,···ইত্যাদির ল. সা. গু. হয় এবং ফ যদি চ, ছ, জ, ইত্যাদির গ. সা গু হয়, তাহলে উপোরক্ত প্রতিটি সংখ্যা অখণ্ড হবে এবং প্রতিজ্ঞা 1 অনুসারে প/ফ সংখ্যাটি ক্ষুদ্রতম বা লঘিষ্ঠ হবে। ল. সা. গু-এর সংজ্ঞানুসারে প/ফ সংখ্যাটি আলোচ্য ভগ্নাংশগুলির ল. সা. গু হবে।

সূত্র 1. ক/চ, খ/ছ, গ/জ... ইত্যাদি লঘিষ্ঠ আকারের ভগ্নাংশের

$$\text{ল. সা. গু.} = \frac{\text{ক, খ, গ,... ইত্যাদির ল. সা. গু.}}{\text{ছ, ছ, জ,.. ইত্যাদির গ. সা. গু.}} = \frac{\text{লবগুলির ল. সা. গু.}}{\text{হরগুলির গ. সা. গু.}}$$

উদাহরণ 1. $3\frac{1}{2}$, $5\frac{1}{4}$ এবং $\frac{2}{24}$ ভগ্নাংশগুলির ল. সা. গু নির্ণয় কর।

সমাধান ঃ ভগ্নংশগুলিকে প্রকৃত এবং লঘিষ্ঠ আকারে পরিবর্তিত করলে হবে $\frac{7}{2}$, $\frac{21}{4}$ এবং $\frac{1}{12}$; লবগুলির অর্থাৎ

7, 21 এবং 1 সংখ্যাগুলির ল. সা. গু $=21$ এবং হরগলির অর্থাৎ 2, 4 এবং 12 সংখ্যাগুলির গ. সা. গু $=2$।

$\therefore$ প্রদত্ত ভগ্নাংশগুলির ল. সা. গু.

$$=\frac{\text{লবগুলির ল. সা. গু}}{\text{হরগুলির গ. সা. গু}}=\frac{21}{2}=10\frac{1}{2}$$

ভগ্নাংশের গ. সা. গু নির্ণয়ের সূত্রটির আলোচনায় আসা যাক। এক্ষেত্রে এমন একটি সংখ্যা ব/ভ (অখণ্ড বা ভগ্নাংশ) নির্ণয় করতে হবে যার দ্বারা আলোচ্য প্রতিটি সংখ্যা বিভাজ্য হবে এবং এর থেকে বড় কোনো সংখ্যা এই শর্ত পালন করবে না ; অর্থাৎ

$\frac{ক}{চ}\div\frac{ব}{ভ}=\frac{ক}{চ}\times\frac{ভ}{ব}$, $\frac{খ}{ছ}\div\frac{ব}{ভ}=\frac{খ}{ছ}\times\frac{ভ}{ব}$, $=\frac{ক}{চ}\div\frac{ব}{ভ}$ ইত্যাদি।

সংখ্যাগুলি অখণ্ড সংখ্যা হবে এবং ব/ভ সংখ্যাটি উপরোক্ত শর্তাধীনে বৃহত্তম হবে। এটি হওয়ার জন্য ব-কে ক, খ, গ, ...ইত্যাদি সংখ্যাগুলির গ. সা. গু এবং ভ-কে চ, ছ, জ, ইত্যাদি সংখ্যাগুলির ল. সা. গু. হতে হবে। প্রতিজ্ঞা 2 অনুসারে ব/ভ সংখ্যাটি বৃহত্তম বা গরিষ্ঠ হবে এবং গ. সা. গ-র সংজ্ঞানুসারে ব/ভ সংখ্যাটি আলোচ্য ভগ্নাংশগুলির গ. সা. গু. হবে।

সূত্র 2. ক/চ, খ/ছ, গ/জ, ইত্যাদি লঘিষ্ঠ আকারের ভগ্নাংশের

গ. সা. গু $=\frac{\text{ক, খ, গ,...ইত্যাদির গ. সা. গু.}}{\text{চ, ছ, জ, ইত্যাদির ল. সা. গু.}}$

$=\frac{\text{লবগুলির গ. সা. গু.}}{\text{হরগুলির ল. সা. গু}}$

উদাহরণ 2. $\frac{7}{8}$, $8\frac{2}{5}$ এবং $\frac{21}{15}$ ভগ্নাংশগুলির গ. সা. গু নির্ণয় কর।

সমাধান : প্রকৃত এবং লঘিষ্ঠ আকারে রূপান্তরিত ভগ্নাংশসমূহের লবগুলির গ, সা. গু $=7$ এবং হরগুলির ল. সা. গু $=40$, অতএব, প্রদত্ত ভগ্নাংশগুলির গ. সা. গু $=7/40$।

28/4/2/1B শ্রীমোহন লেন, কলিকাতা-26

মডেল

মডেল বানাতে গিয়ে ঃ ছয়

রাজেশ গিরি

টাইমার ইউনিট ঃ

টাইমার ইউনিটটী খুবই সাধারণ, এটা টাইমার IC 555 দিয়ে তৈরী। এর ট্রিগ্রার টার্মিনালটা গ্রাউণ্ডে ছোঁয়ালে টাইমার সক্রিয় হবে এবং এর রিলেটা (RL) অন হবে ফলে রিলের N/O কণ্টাক্টের সঙ্গে যুক্ত সাইরেন

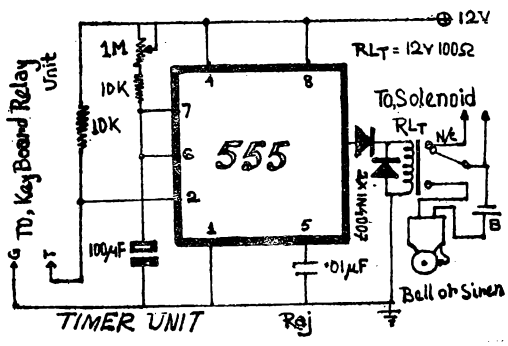

অথবা বেলটা বাজতে থাকবে। রিলেটা অন থাকবে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত এবং সময়টা স্থির করা যাবে 1MΩ এর পোটেনশিওমিটারটা ঘুরিয়ে অ্যাডজাষ্ট করে। এক্ষেত্রে প্রায় 1 থেকে 100 সেকেণ্ডের মধ্যে যে কোন সময়ের জন্য টাইমারকে অন রাখা যাবে। টাইমারের গ্রাউণ্ড টার্মিনাল এবং ট্রিগ্রার টার্মিনাল দুটো যুক্ত হবে কিবোর্ড-রিলে ইউনিটের প্রত্যেকটা রিলের N/C কণ্ট্যাক্টসে। যখন কিবোর্ডে কোন ভুল সুইচ অন করা হবে তখন তার পূর্ববর্তী রিলেটা অন না থাকায় ঐ সুইচের মাধ্যমে পূর্ববর্তী রিলের N/C কণ্টাক্টসের সঙ্গে টাইমারের গ্রাউণ্ড এবং ট্রিগ্রারের সংযোগ ঘটবে এবং সাইরেন বা বেলটা বাজতে থাকবে। এই অবস্থায় রিলেটার (RL) N/C ওপেন হয়ে যাওয়ায় এর সাথে যুক্ত—লকিং সার্কিট ছিন্ন হয়ে যাবে ফলে টাইমার যতক্ষণ চালু থাকবে তার মধ্যে লকটা খোলার কোন উপায় থাকবে না।

রাজেশ গিরি-ঘোড়াধরা-ঝাড়গ্রাম-মেদিনীপুর-721507

সহজ কথায় রসায়ন অমরনাথ রায়

[দুই]

মৌলদের চিহ্ন প্রকাশের উপায় এখনও শেষ হয় নি, কিন্তু অনেক মৌলিক পদার্থ আছে, যাদের ল্যাটিন নামের প্রথম অক্ষর কিংবা প্রথম অক্ষরের সঙ্গে দ্বিতীয় বা আরেকটি অক্ষর যোগ করে মৌলটিকে চিহ্নিত করা হয় যেমন ঃ

মৌলের ইংরেজী নাম		ল্যাটিন নাম		চিহ্ন
সোডিয়াম	(Sodium) ...	Natrium	...	Na
পটাসিয়াম	(Potasslum) ...	Kalium	...	K
গোল্ড	(Gold) ...	Aurum	...	Au
আয়রন	(Iron) ...	Ferrum	...	Fe
কপার	(Copper) ...	Cuprum	...	Cu
লেড	(Lead) ...	Plumbum	...	Pb

ইত্যাদি।

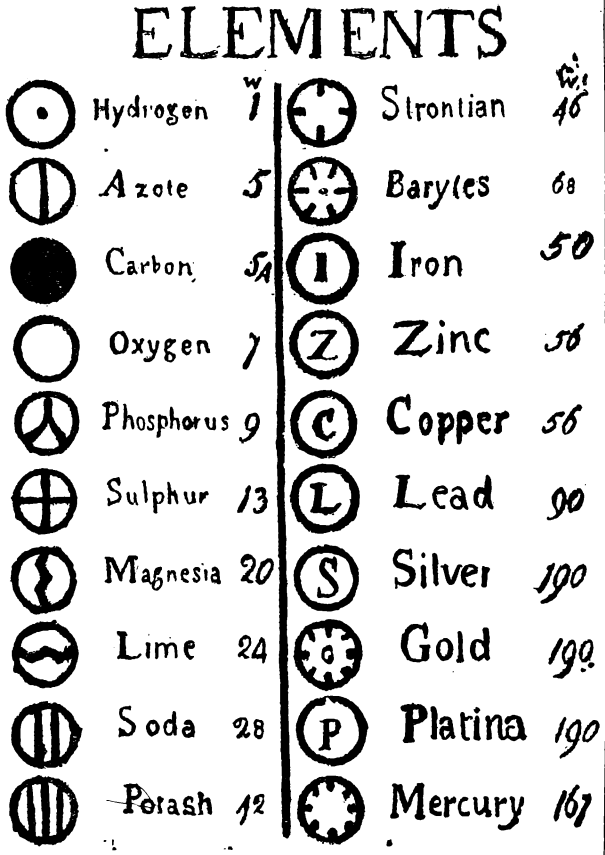

ডালটন প্রবর্তিত মৌলের পরমাণুর প্রতীক

মৌলগুলিকে কিভাবে আধুনিক পদ্ধতিতে চিহ্নিত করা হয় তা তো আগের সংখ্যায় বলেছি, কিন্তু এই প্রসঙ্গে মৌলের নামের / চিহ্নের উৎস বা অর্থের কথাও জানতে ইচ্ছে হওয়া স্বাভাবিক। তাই কতকগুলি মৌলের নামের বা চিহ্নের উৎস সন্ধানে আসা যাক্।

মৌলের নাম	চিহ্ন	চিহ্নের নামের অর্থ / উৎস
অ্যালুমিনিয়াম	... Al	Alum (ফটকিরি) শব্দটি মৌলের নামের উৎস।
আর্গন	... A	Inactive (নিষ্ক্রিয়) আর্গন একটি গ্রীক শব্দ।
আর্সেনিক	... As	Arsenicum শব্দটি এই মৌলের নামের উৎস।
বেরিয়াম	... Ba	মৌলটির নামের অর্থ Heavy (ভারী)।
বিসনাথ	... Bi	মৌলটির নামের অর্থ White mass (সাদা বস্তু)।
বোরন	... B	Buraq শব্দটি মৌলটির নামের উৎস।
ব্রোমিন	... Br	মৌলটির নামের অর্থ Stench অর্থাৎ পচা দুর্গন্ধ।
ক্যাডমিয়াম	... Cd	মৌলটির নামের অর্থ Earth অর্থাৎ পৃথিবী বা মাটি।
ক্যালসিয়াম	... Ca	চিহ্নের উৎস ল্যাটিন শব্দ Calx.
ক্যালিফোর্নিয়াম	Cf	California শব্দ হতে উৎপন্ন হয়েছে এই মৌলের নাম।
কার্বন	... C	Carbo, Charcoal শব্দ এই মৌলের নামের উৎস।
সিরিয়াম	... Ce	Ceres (সিরেস) শব্দ থেকে এর নাম উৎপন্ন হয়েছে।
সিজিয়াম	... Cs	Sky blue (আকাশের মতো নীল রং) সিজিয়াম শব্দের অর্থ।
ক্লোরিন	... Cl	Greenish yellow (সবুজাভ পীত রং) ক্লোরিন শব্দের অর্থ।

মৌলের নাম	চিহ্ন	চিহ্নের নামের অর্থ / উৎস
ক্রোমিয়াম	Cr	Chrom নামক গ্রীক শব্দ থেকে এই নামটি এসেছে।
কোবাল্ট	Co	জার্মান শব্দ Kobold থেকে কোবাল্ট শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে।
কপার	Cu	ল্যাটিন শব্দ Cuprum থেকে এই মৌলের প্রতীকের সৃষ্টি হয়েছে।
কিউরিয়াম	Cm	Curie শব্দ থেকে এই মৌলের নামের উৎপত্তি হয়েছে।
এরবিয়াম	Er	সুইডেনের Ytterbey নামক শহরের নাম থেকে এই মৌলের নামের উৎপত্তি হয়েছে।
ইউরোপিয়াম	Fu	Europe শব্দটি এই মৌলের নামের উৎস।
ফ্লোরিন	F	ফ্লোরিন নামের অর্থ to flow অর্থাৎ বহমান।
ফ্রানসিয়াম	Fr	France দেশের নাম থেকে ফ্রানসিয়াম শব্দটি এসেছে।
গ্যাডোলিনিয়াম	Gd	রসায়নবিদ Johan Cadoline-এর নামানুসারে এই মৌলের নামকরণ হয়েছে।
গ্যালিয়াম	Ga	France এর ল্যাটিন নাম Gallia এই মৌলের নামের উৎস।
গোল্ড	Au	ল্যাটিন শব্দ Aurum এই মৌলের প্রতীকের উৎস।
হাফনিয়াম	Hf	কোপেনহেগেনের Hafnia নগরীর নামানুসারে এই মৌলের নাম রাখা হয়েছে।
হিলিয়াম	He	সূর্যের নাম Helios থেকে মৌলটির নামের উৎপত্তি হয়েছে।
হোলমিয়াম	Ho	সুইডেনের Stockholm নগরীর নাম থেকে এই মৌলের নাম রাখা হয়েছে।
হাইড্রোজেন	H	গ্রীক শব্দ Hydro অর্থাৎ জল, এই মৌলের নামের উৎস।
ইণ্ডিয়াম	In	Indigo শব্দটি এই মৌলের নামের উৎস।
আয়োডিন	I	Iodes (অর্থাৎ Violet) শব্দটি থেকে আয়োডিন নামটি এসেছে।
ইরিডিয়াম	Ir	Iris (অর্থাৎ রামধনু) ইরিডিয়াম নামের উৎস।
আয়রন	Fe	ল্যাটিন শব্দ Ferrum এই মৌলের প্রতীকের উৎস।
ক্রিপটন	Kr	গ্রীক শব্দ Kriptos (অর্থাৎ hidden) থেকে Kr প্রতীকটি এসেছে।
ল্যান্থানাম	La	গ্রীক শব্দ Lanthano (অর্থাৎ to conceal) থেকে এই মৌলের নামকরণ হয়েছে।
লিথিয়াম	Li	Lithos (অর্থাৎ পাথর) শব্দ থেকে এই মৌলের নামটি এসেছে।

ফ্ল্যাট C-19/2, কালিন্দী হাউসিং এস্টেট, যশোহর রোড. কলকাতা-700 089।

ইউনেসকো ও রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রাপ্ত

অমরনাথ রায়ের

স্টুডেন্টস সায়েন্স এনসাইক্লোপিডিয়া

দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ শীঘ্রই প্রকাশিত হবে ॥ দাম 40·00

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯

পৃথিবীর বৃহত্তম জলজ উদ্ভিদ

এণাক্ষী বিশ্বাস

পৃথিবীতে কত রকমের বিচিত্র উদ্ভিদ আছে। এই রকম এক বিচিত্র ও আকর্ষণীয় উদ্ভিদের কথা বলব—সেটি জলজ উদ্ভিদ। শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের পুকুরগুলির সেপ্টেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি পর্যন্ত শোভা বাড়ে তাদের বিরাটাকার কানা উঁচু পাতার সৌন্দর্যে।

এর ইংরাজী নাম জায়েন্ট ওয়াটার লিলি। আর বৈজ্ঞানিক নাম ভিক্টোরিয়া আমাজোনিকা। এটি নিমফিয়েসী গোত্রের অর্থাৎ পদ্ম জাতীয় উদ্ভিদের অন্তর্গত। এটি আমাদের দেশের উদ্ভিদ নয়। এটি দক্ষিণ আমেরিকার উদ্ভিদ। আর নিজের দেশে এটি অনেক বছর বাঁচে। অন্যান্য দেশে বর্ষজীবি। তাই শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের সৌন্দর্য বাড়াতে প্রতি বছরই এই উদ্ভিদটির নতুন করে চাষ করতে হয়।

1801 খ্রীস্টাব্দে উদ্ভিদবিজ্ঞানী হ্যানকে বলিভিয়াতে এই উদ্ভিদটিকে প্রথম আবিষ্কার করেন। অতঃপর 1820 খ্রীস্টাব্দে বনপল্যাণ্ড আর্জেন্টিনাতে অবস্থিত করিয়েন্টেসে দেখতে পান। 1832 খ্রীস্টাব্দে পোপেগ আমাজন নদীতে এই অতিকায় জলজ উদ্ভিদটি দেখতে পান এবং নামকরণ করেন ইউরাইল আমাজোনিকা। তারপর 1836 খ্রীস্টাব্দে স্যার রবার্ট এইচ সোমবার্ক বৃটিশ গিয়েনার বারবিস নদীতে দেখতে পান। তিনিই এই উদ্ভিদটির একটি নমুনা সংগ্রহ করে ইংল্যাণ্ডের উদ্ভিদবিজ্ঞানী ডঃ লিণ্ডলের কাছে প্রেরণ করেন। তিনি উদ্ভিদটি বর্ণনা করেন ও লণ্ডনের কিউ গার্ডেনে চাষ করার চেষ্টা করেন। দীর্ঘ বার বছর চেষ্টার পর অবশেষে সাফল্য লাভ করলেন। ভিক্টোরিয়া আমাজোনিকার ইতিহাসে 1849 খ্রীস্টাব্দটি স্মরণীয় বছর। এই বছরেই লণ্ডনের কিউ উদ্যানে প্রথম ফুলটি ফোটে, ব্যাসে প্রায় 15 ইঞ্চ মহাসমারোহে মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে উপহার দেওয়া হয়। আর তাঁরই সম্মানার্থে এই অভিজাত উদ্ভিদটির নামকরণ হয় ভিক্টোরিয়া আমাজোনিকা।

জলাশয়গুলিতে পাতাগুলি সুবৃহৎ থালার মত দেখতে লাগে। সেজন্য দক্ষিণ আমেরিকাতে চলিত ভাষায় ওয়াটার প্লেটার বলে। তাছাড়া এখানকার অধিবাসীরা এই উদ্ভিদটির বীজ খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে সেজন্য আর একটি জনপ্রিয় নাম ওয়াটার কর্ন।

উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রাজত্বকাল। সুতরাং দেখা যায় লণ্ডনের কিউ উদ্যানে সাফল্যের পর 1851 খ্রীস্টাব্দে 9ই সেপ্টেম্বর ডঃ ওয়ালিচ ইংল্যাণ্ড থেকে এই উদ্ভিদটির বীজ কলিকাতা উদ্যানের জন্য পাঠান। 6ই নভেম্বর বীজ বপন করা হয়। 1853 খ্রীস্টাব্দের 13ই মে অঙ্কুরোদগম হয়।

তারপর দীর্ঘকাল অনুপস্থিতির পর 1923 খ্রীস্টাব্দে ভারতীয় উদ্ভিদ উদ্যানে ডঃ সি. সি. ক্যালডারের তত্ত্বাবধানে উদ্ভিদটির নতুনভাবে চাষ করার চেষ্টা করা হয় এবং কয়েক বছর উদ্যানের জলাশয়গুলি অপূর্ব সুষমামণ্ডিত হয়ে ওঠে।

বিশালাকার পাতা কতকটা কানা উঁচু প্রায় গোলাকার থালার মত জলাশয়ের শোভা বিস্তার করে।
পরিমাপে পাতাগুলির ব্যাস 5 ফুট থেকে 7 ফুট হয়, কখনও কখনও আরও বেশি হয়। কানাগুলির উচ্চতা প্রায় 2 ইঞ্চি থেকে 8 ইঞ্চি হয়। পাতাগুলি জলের ওপর ভাসমান অবস্থায় থাকে। পাতার উপরের ত্বক তৈলাক্ত ও গাঢ় সবুজ বর্ণের হয়। তৈলাক্ত হওয়ার দরুন পাতার উপর জল জমতে পারে না। বৃষ্টির জল পড়লে হাওয়ার দোলাতে পত্রের স্থিতিস্থাপকতা সম্পন্ন কণাগুলি দুলতে থাকে। ফলে জল পাতার উপর থেকে বাইরে পড়ে যায়। পত্ররন্ধ্র বা স্টোমাটা উপরের ত্বকেই থাকে, নীচের ত্বকে থাকে না। এই পত্ররন্ধ্র শুধু গ্যাসই নির্গত করে না আবার তা গ্রহণ করে এবং সালোকসংশ্লেষ শ্বাসকার্য, বায়ু থেকে জলীয় বাষ্প গ্রহণ এবং অতিরিক্ত জল বাষ্পাকারে নির্গত করতে সাহায্য করে। পাতার ভিতর প্রচুর বাতাবকাশ আছে যা পাতাকে ভেসে থাকতে সাহায্য করে।

পাতার নীচের ত্বক বেগুনী সবুজ বর্ণের হয় এবং শিরাবিন্যাস উল্লেখযোগ্য। পত্রবৃন্তের কেন্দ্রবিন্দু থেকে কতকগুলি মোটা শিরা কিনারার দিকে বিস্তৃত। এই শিরাগুলি সরু সরু শিরা দ্বারা যুক্ত হয়ে কতকগুলি কম্পার্টমেন্টে বিভক্ত হয়েছে। এই শিরাগুলির ভিতর বায়ুনালী আছে আর বাইরে শক্ত কাঁটা ব্যাপৃত।

ইংল্যাণ্ডের অন্যতম স্থপতি স্যার যোশেফ প্যাক্সটন ভিক্টোরিয়া আমাজোনিকা পাতার নিম্নতলের শিরাবিন্যাস দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে লণ্ডনের বিখ্যাত ক্রিস্টাল প্রাসাদ নির্মাণ করেন। উক্ত প্রাসাদটি 1851 খ্রীস্টাব্দ থেকে 1936

খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত লণ্ডন শহরের একটি দ্রষ্টব্য স্থান হিসাবে পরিগণিত ছিল। পরবর্ত্তীকালে এই বিখ্যাত প্রসাদটি অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়।

আরও চিত্তকর্ষক ঘটনা এই বিশালাকার পাতার ওপর 17-18 বছরের ছেলে বা মেয়ে অনায়োসেই বসে থাকতে পারে ডুবে যায় না। এর কারণ (1) এই উদ্ভিদটির প্রস্থচ্ছেদ করলে দেখা যাবে প্রচুর অতিরিক্ত বায়ুথলি ও বায়ুজালী আছে যা সব সময় পাতাকে জলের ওপর হাল্কা হয়ে ভাসতে সাহায্য করে ; (2) পাতাটিকে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে পাতার পত্রবৃন্তটি ঠিক কেন্দ্রবিন্দুতে যুক্ত। এর ফলে পাতাটির যান্ত্রিক ক্ষমতা বা Mechanical support অনেক বেশী হয়। তার সঙ্গে পাতার বৈশিষ্ট্য পূর্ণ শিরা-বিন্যাসও উল্লেখযোগ্য। (3) পদার্থ বিজ্ঞানী আর্কিমিডিসের প্লবতা ধর্ম বা buoyancy সূত্রটি এখানে কাজ করছে। কিভাবে ? পাতাগুলি অতিকায় হওয়ার জন্য যে পরিমান জল অপসারণ করে তার ওজনের সমান জলের উর্দ্ধচাপ। ফলে 17-18 বছরের ছেলেমেয়েরা পাতার ওপর সহজেই বসে থাকতে পারে, ডুবে যায় না। একটু বেশী ভারী শরীরের অধিকারী ছেলে-মেয়েরা এই পাতার ওপর বসার আগে একটি পাতলা কাঠের পাটাতন পাতার ওপর পেতে রেখে তার ওপর বসতে পারে।

পত্রবৃন্ত ও পুষ্পবৃন্ত খুব লম্বা হয় না কারণ ভিক্টোরিয়া আমাজোনিকা অগভীর জলাশয়ে হয়। দেখা গেছে আমাজন নদীর গভীরতা যেখানে দু' ফুট ও দো আশ মাটি, সেখানেই এই উদ্ভিদটির প্রাচুর্য। এগুলির গায়ে প্রচুর কাঁটা থাকে এবং প্রচ্ছছেদে দেখা যায় প্রচুর বাতাবকাশ আছে।

এই উদ্ভিদটির কাণ্ড বলতে রাইজোম। এটি বেশ মাংসল ও নরম হয় এবং টিপলে জল ও বাতাস বের হয়ে আসে। সুতরাং এর মধ্যে অতিরিক্ত বাতাস থাকার ফলে জলের মধ্যে থেকেও এরা বায়ুর অভাব বোধ করে না। রাইজোমে কতকগুলি পর্ব থাকে। এই পর্বের উপর দিকে পত্রবৃন্ত ও নীচের দিকে অস্থানিক মূল থাকে।

ফুলের প্রসঙ্গে বলতে গেলে বলতে হয় পদ্মফুলের সঙ্গে কিছু সাদৃশ্য আছে। তবে ফুলের সময় ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি পযন্ত। 8 থেকে 15 ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত ফুল দেখতে পাওয়া যায়। ফুল জলের উপর তল থেকে কিছু উপরে থাকে। প্রথমে ন্যাসপাতির সাইজের কুঁড়ি হয়। প্রথমদিন কুঁড়ি ফোটার সময় রঙ ক্রীমসাদা হয় এবং ধীরে ধীরে রঙ পরিবর্ত্তিত হয়ে গোলাপী রঙ হয়। ফুল সন্ধ্যার সময় প্রস্ফুটিত হয়। সম্পূর্ণ ফুটে গেলে পাঁপড়িগুলি বাইরের দিকে বেঁকে যায়। ফুলের বৃতি গর্ভাশয়ের নীচে যুক্ত হয়। বাইরের দিকে রঙ পার্পল হয় ও বৃতির ভিতরের রঙ সাদা হয়। পাঁপড়ি অসংখ্য হয়। পুংকেশরও অসংখ্য হয়। তবে তা দুই রকমের থাকে ফার্টাইল ও স্টেরাইল। গর্ভাশয় বৃতির টিউবের সঙ্গে যুক্ত থাকে। সন্ধ্যার পর ফুলের মিষ্টি সুবাস অনেক দূর থেকে পাওয়া যায়। মিষ্টি সুবাসের সঙ্গে সঙ্গে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া থেকে ফুলের তাপ-মাত্রা দশ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড বেড়ে যায়।

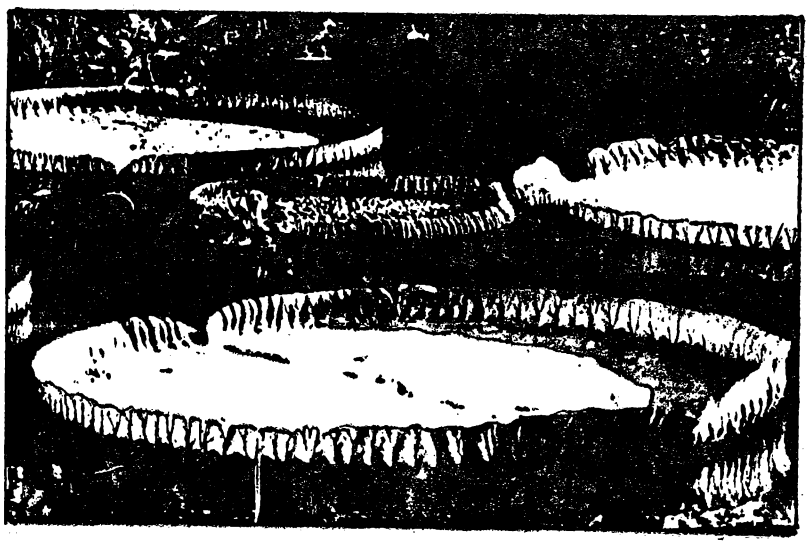

ভারতায় উদ্ভিদ উদ্যানে পৃথিবীর বৃহত্তম জলজ উদ্ভিদ ভিক্টোরিয়া আমাজোনিকার সমাবেশ। যার পাতার ওপর সাত-আট বছরের ছেলে সহজেই বসে থাকতে পারে।

বরফ যদি গলে

সমীর কুমার ঘোষ

পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তের শেষ বিন্দু সুমেরু ও কুমেরু সম্বন্ধে আগ্রহের শেষ নেই আমাদের। এই দুই প্রত্যন্ত অঞ্চল সম্বন্ধে জানবার জন্য মানুষ বহুযুগ আগে থেকেই নানা অভিযান ও পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে আসছে, সাম্প্রতিককালে কুমেরু অভিযান ও সেখানকার আবহাওয়া, জলবায়ু, প্রাকৃতিক অবস্থা ও অন্যান্য নানা বিষয় সম্বন্ধে জানবার জন্য বেশ কয়েকটি বৈজ্ঞানিক অভিযানও হয়ে গেছে এবং বলতে গেলে, এখনো একটি বৈজ্ঞানিক দল কুমেরু অঞ্চলে উপস্থিত থেকে, নানারকম বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা সেখানে চালিয়ে যাচ্ছেন। এ হেন কুমেরু বা সুমেরু সম্বন্ধে এক নতুন তথ্যই এই আলোচনার বিষয়বস্তু।

আমরা জানি যে, পৃথিবীর এই দুই প্রান্তিক অঞ্চল সম্পূর্ণভাবে বরফে ঢাকা, যে বরফ কয়েক লক্ষ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এবং যার গভীরতা বেশ কয়েক হাজার ফুট। সারা পৃথিবীতে স্বাভাবিকভাবে সঞ্চিত বরফের আয়তন আনুমানিক হিসাব অনুযায়ী প্রায় 50 লক্ষ বর্গমাইল। এর প্রায় অধিকাংশটাই পৃথিবীর দুই মেরু অঞ্চলে রয়েছে। কিন্তু মানুষ এখন তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় যে হারে কয়লা, গ্যাস, তেল বা পারমাণবিক জ্বালানী ব্যবহার করছে এবং তার ফলে যে তাপ উৎপন্ন হচ্ছে, সেই তাপ বাতাসের সাহায্যে অনবরতই মেরু অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। ফলে সেখানকার জমা ঐ বরফ ক্রমশঃই গলে যাচ্ছে। মেরু অঞ্চলের এই বরফ গলে যাওয়ার প্রক্রিয়া অবশ্য খুব আস্তে আস্তে ঘটছে। সুমেরু অঞ্চলে আর্কটিক মহাসাগরে (Arctic Ocean) যে ভাসমান বরফ আছে, প্রথমে সেই পাতলা স্তরের ভাসমান বরফ এই গরম তাপ প্রবাহের ফলে গলতে শুরু করবে, এর পরে গ্রীণল্যাণ্ড অঞ্চলে যে বরফ রয়েছে (পৃথিবীর মোট বরফের 11 শতাংশ) সেই বরফ গলবে। বছরের পর বছর এভাবে ভয়াবহ আকারে মানুষের জ্বালানী ব্যবহারের ফলে যে তাপের সৃষ্টি হতে থাকবে, তার জন্য প্রাকৃতিক ভারসাম্যের হেরফের ঘটতে থাকবে এবং প্রকৃতির যে সব উপাদানের উপর এই প্রাকৃতিক ভারসাম্য নির্ভর করে, সেই সব উপাদানও বিশেষভাবে বিঘ্নিত হবে এবং দুই এক দশকের মধ্যে মানুষের তৈরী এই কৃত্রিম তাপের ফলে। পৃথিবীতে সঞ্চিত মোট বরফের প্রায় 90 শতাংশই গলে যাবে এবং তার ফলে কি হবে ?

কি হবে ?—এ এক বিরাট প্রশ্ন। বিস্তারিতভাবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফলের কথা চিন্তা না করলেও প্রাথমিক ভাবে এই বরফ গলে যাওয়ার পরিণাম যদি চিন্তা করা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে, পৃথিবীর মহাসাগরগুলির জল, এই বরফ গলার ফলে বর্তমান অবস্থা থেকে প্রায় 160—200 ফুট উঁচুতে উঠে যাবে। যার ফলে মহাসাগরগুলির উপকূল অঞ্চলগুলির বিস্তৃত এলাকা জলপ্লাবিত হয়ে পড়বে। এই বিপর্যয় ক্রমশঃই বাড়তে থাকবে এবং পৃথিবীর জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে, বিভিন্ন দেশের পরমাণুচুল্লী ও বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলি যতই তাদের কার্যক্ষমতা ক্রমশঃ বাড়াতে থাকবে, ততই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে কৃত্রিমভাবে উৎপন্ন তাপের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং তার ফলে এই বিপর্যয় ক্রমশই আরো প্রকট হয়ে উঠবে।

উপকূল অঞ্চলে যে সমস্ত দেশগুলির তটভূমি সমতলীয়, সেই দেশগুলি ক্রমেই বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যেমন তারা ঘূর্ণিঝড় বা অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের শিকার সহজেই হয়ে পড়ে। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে, আমাদের প্রতিবেশী বাংলাদেশ সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, কারণ বাংলাদেশের তটভূমির প্রায় শতকরা আশি ভাগই সমুদ্রতটের সঙ্গে একই তলে অবস্থিত। সমুদ্রের ধারে সামুদ্রিক ঝড় থেকে বাঁচবার জন্য যে সব উঁচু প্ল্যাটফর্ম বা বাঁধ তৈরী করা হয়, সেগুলি কোন কাজেই আসবে না কারণ স্বয়ং সমুদ্রই যদি বরফ গলা জলে নিজেই উঁচুতে উঠে যায়, তাহলে বাঁধ বা অন্য কিছু তাকে আটকাবে কিভাবে ? মেরু অঞ্চলে বরফ হঠাৎ সব গলে গিয়ে সমুদ্রের জলের স্ফীতি ঘটিয়ে যে কি অসাধারণ ও ভয়াবহ সব পরিণতি ঘটাতে পারে, সে সব বিস্তারিতভাবে হয়ত হিসাব নিকাশ করা এখনই সম্ভব নয়। তবুও একটা কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, পৃথিবীর বহু উন্নত ও গুরুত্বপূর্ণ সব সহর, যেগুলি সমুদ্র উপকূলে রয়েছে। সেগুলি সব ভেসে যাবে। এগুলির মধ্যে প্রথমেই যে সহরগুলির কথা মনে হয় তার মধ্যে রয়েছে—বোম্বাই, কলকাতা, মাদ্রাজ, ভেনিস, টোকিও লণ্ডন, আমস্টার্ডাম, নিউইয়র্ক, ওকাসা, সাংহাই, সিডনী, রোম, ওয়াশিংটন ইত্যাদি। এরা সকলেই একে একে কালক্রমে সমুদ্রের গর্ভে চিরতরে বিলীন হয়ে যাবে।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এই ভয়াবহ পরিণতি কি অবশ্যম্ভাবী ? মেরু অঞ্চলের বরফ সত্যি সত্যি কি ক্রমশঃ গলে গিয়ে মানবসভ্যতার বিকাশকে এই ভয়াবহ পরিণতির দিকে ঠেলে দেবে ? এই প্রশ্নের উত্তর হ'ল যে, হ্যাঁ—এবং

তা হবেই, যদি আমরা আমাদের এই ক্রমবর্ধমান সুখ-সুবিধার চাহিদা প্রতিদিন বাড়িয়ে যেতে থাকি। একটা কথা আমাদের মনে রাখতেই হবে যে, শক্তির অপচয় ঘটিয়ে যদি আমরা প্রতিদিন ক্রমশঃ প্রাকৃতিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতে থাকি, তাহলে এই চরম ও ভয়াবহ পরিণতি থেকে কেউ আমাদের বাঁচাতে পারবে না। অথচ বাতাসে তাপীয় দূষণ (thermal pollution) এভাবে প্রতি মুহূর্তে না ঘটিয়ে যদি আমরা অনন্ত ও অবিনশ্বর সূর্যের অপরিসীম শক্তির ভাণ্ডারকে আমাদের কাজে লাগাতে পারি, তাহলেই একমাত্র এই পরিণতি থেকে আমাদের মুক্তির উপায়, নচেৎ আর কয়েক দশকের মধ্যেই পৃথিবীর অধিকাংশ সহর সমুদ্র-গর্ভে বিলীন হয়ে যেতে বাধ্য।

এখনো সময় আছে ভেবে দেখার—নয় কি ?

পদার্থবিদ্যা বিভাগ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের সেরা সম্ভার

সুকুমার সরকার
অমল বন্দ্যোপাধ্যায়

বুক অফ নলেজ

৩২তম সংস্করণ **দাম : ২৫.০০**

বর্তমান কিশোর-কিশোরীদের কাছে 'ক্যুইজ কনটেস্ট' বা প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা বিষয়টি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তাই পাঁচশ' ক্যুইজ আলাদা ভাবে "একের মধ্যে অনেক" নাম দিয়ে নোতুন সংস্করণে দেওয়া হলো। আবার ক্যুইজের মাধ্যমে জানার সীমাবদ্ধতার কথা স্মরণে রেখে বহু বিষয়ের, যেমন : মহাকাশের কথা'য়—আমাদের সৌরজগৎ; বহু আলোচিত ভলক্যান, এক্স, এক্স-ওয়ান ও এক্স-টু গ্রহের অস্তিত্ব সম্পর্কে এবং সূর্যের মতো অন্য কোনো তারার গ্রহমণ্ডল আছে কিনা তা নিয়ে অতি-আধুনিক তত্ত্ব ও তথ্যের সাহায্যে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচিত হয়েছে বিজ্ঞান-ইতিহাস-সাহিত্য ইত্যাদি বহু শাখার নানা কথা ; সময় গণনার ইতিহাস, ঘৃণিত ও পূজিত রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের নায়কদের কথা, ডাক-বিভাগ, পশুপক্ষী, গাছপালা, খেলাধুলোর কথা, অংকের ধাঁধা আরও কত কি! এক কথায়, কিশোর-কিশোরী ও তরুণ-মনের কৌতূহল ও চির-অনন্ত জ্ঞান-পিপাসা এই নোতুন সংস্করণ পাঠে পরিতৃপ্তি লাভ করবে। শুধু তা কেন, এ সংস্করণ পাঠে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য এনে দেবে।

মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
10 বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট/কলকাতা : ৭০০০৭৩

পুজো সংখ্যায়

কম খরচে 10টি অভিনব মডেল সার্কিট ডায়াগ্রাম সহ লিখবেন :

বিপ্লব ব্যানার্জী ॥ সৌম্য মিত্র
দীপেন ভট্টাচার্য ॥ সৌমেন্দু বিকাশ পাত্র
মলয় খাঁটুয়া ॥ নির্মলেন্দু বিকাশ পাত্র
অনুরুদ্ধ সরকার ॥ অভিজিৎ সরকার
গিরীশ রায় বর্মন ॥ ভাস্কর চট্টোপাধ্যায়
এবং পার্থসারথি চক্রবর্তী

এবং 10টি চমকপ্রদ সায়েন্স এক্সপেরিমেন্টস হাতে কলমে শেখাবেন :

সন্তোষ মিত্র ॥ অমরনাথ রায়
দিবাকর সেন ॥ অপাজিত বসু
কুঞ্জবিহারী পাল ॥ সমীরকুমার ঘোষ
ও আরও অনেকে

পুজোর ছুটী ফুরিয়ে গেলেও যে বইয়ের প্রয়োজন ফুরোয় না

শারদীয়

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

বেরোবে পুজোর আগেই

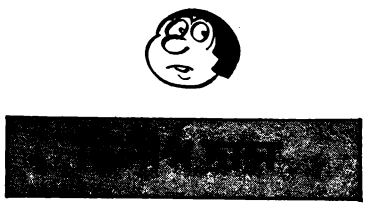

খুদে বৈজ্ঞানিক
এ্যাইরে, মেজকা নির্ঘাৎ কোনো কিছু নিয়ে এক্সপেরিমেন্টে মেতেছে!! দেখে ফেলার আগেই কেটে পড়ি বাবা।
এখন দেখে ফেললেই ঐ এক্সপেরিমেন্ট আমার ওপর পরীক্ষা চালাবে! সুতরাং—
আরে খুদে, ওভাবে চলে যাচ্ছিস কেন?
এ্যাই রে, দেখে ফেলেছে!
কই? ন-না, যাইনি তো! তোমার কাছেই তো এসেছিলুম।
তা, আমার সঙ্গে দেখা না করে ওভাবে গুঁড়ি-মেরে পালাচ্ছিলি যে বড়?
দেখলুম তুমি কী একটা গবেষণায় ব্যস্ত তাই —
ওঃ, এই কথা। আরে জীবনটাই তো গবেষণাময়, আর সংসারটা একটা বিরাট গবেষণাগার।
তা তোমার গবেষণার বিষয় বস্তু কী মেজকা?
এলিক্সার অফ লাইফ, মানে মৃতসঞ্জীবনী।
ওরেব্বাস্!

অ্যাঁ! বল কী?
কেন, তুই কি এতে কোনো সন্দেহ পোষন করছিস খুদে?
মো-মোটেই না!
তোমার এই গবেষণা এখন কোন পর্যায়ে মেজকা?
ফাইনাল পর্যায়ে। এখন খালি টেস্ট বাকি।
বাপস্!
কি হলো? অমন লাফিয়ে উঠে চললি কোথায়?
মরেছে! শেষকালে হয়তো আমার ওপরেই টেস্ট চালাবে। ওদের কিছুতে বিশ্বাস নেই!
না—মানে আমার একটু কাজ আছে। বাড়ি ফিরতে হবে!
তাতে কি? কয়েক মিনিট বসে আমার এক্সপেরিমেন্টটা একটু টেস্ট করে যাওয়া যায় না?
সত্যি কথা বলতে কি মেজকা, আমার পেটটাও ঠিক সুবিধের নেই।
অ—তবে কিনা এই মৃত-সঞ্জীবনী-সব অবস্থাতেই চলে। তোর যখন ইচ্ছে নেই, থাক। আমিই টেস্ট করি।
মেজকা, আমার মনে হয়। এটা আগে অন্য কারুর ওপর টেস্ট করিয়ে নিলে ভাল করতে।
ধুত্তর, এ জিনিস কি আমার নতুন নাকি?

আঃ! এক চুমুকে শরীরের সব ক্লান্তি শ্রান্তি দূর হয়ে গেল।
এখন কেমন বুঝছো মেজকা?
ফ্যান্টাস্টিক! আমার নতুন ফর্মুলায় আসাম দার্জিলিং আর সিলোন ব্লেণ্ড করে—
তুমি তাহলে শেষকালে চা নিয়ে মেতেছো?
শুধু কি আমি? ওয়ার্ল্ডের সবাই। চায়ে কতকগুলো অ্যালক্যালয়েড আছে, যার কাজ হল নার্ভগুলোকে স্ট্রং করে তোলা। ফলে দেহ ও মনের অবসাদ দূর করে একটা এ্যানার্জি ও স্ফুর্তি এনে দেয়।
এগুলো হল—কেফিন, ট্যানিন ও ফস্যাটিসিন। তাই এই চায়ের একটা নাম দিয়েছি, মৃতসঞ্জীবনী
তবে আমি যে শুনেছি, চা পান না বিষ পান!
কোনো কিছু অত্যধিক হলেই খারাপ হবে। তখন এই অ্যাল-ক্যালয়েডগুলোই ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়ায়। যেমন ধর, অগ্নিমান্দ্য, অনিদ্রা, নার্ভগুলো ক্রমশ অবসাদ গ্রস্থ হয়ে পড়ে, দেহ মন দুর্ব্বল হয়ে যায়।
আবার এই চা-ই হৃদরোগীদের পক্ষে উপকারী। তবে এ সব কিছুই পরিমিত ব্যবহারে। চায়ে ফ্লোরাইড বলে একটি উপাদান আছে, সেটা দাঁতের পক্ষে ভাল।
তবে তো তুমি বিরাট জিনিস আবিষ্কার করেছ, মেজকা!

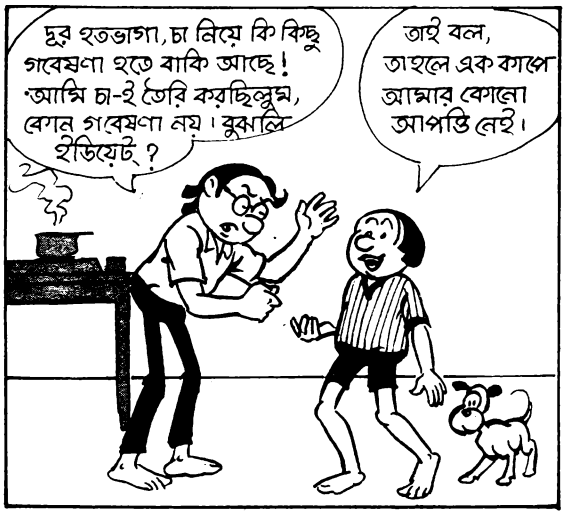

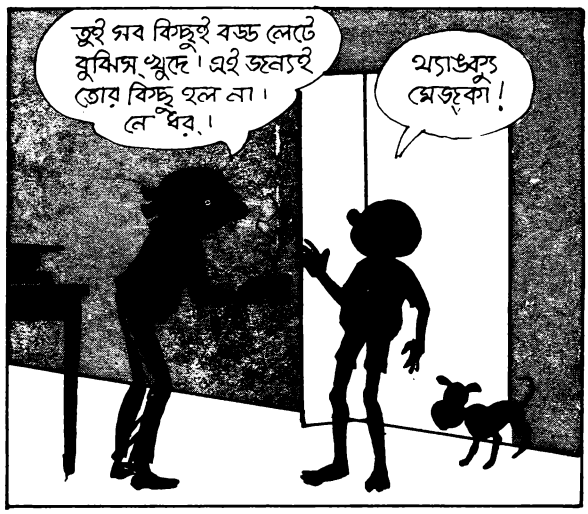

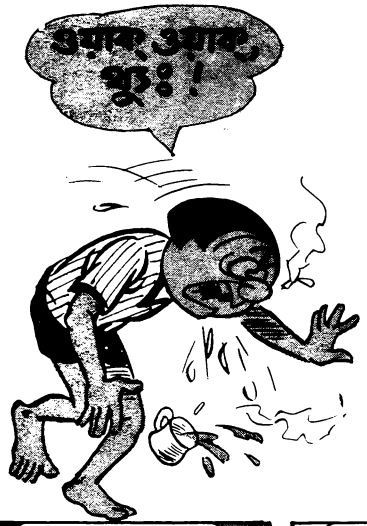

দূর হতভাগা, চা নিয়ে কি কিছু গবেষণা হতে বাকি আছে! আমি চা-ই তৈরি করছিলুম, কোন গবেষণা নয়। বুঝলি ইডিয়েট্?
তাই বল, তাহলে এক কাপে আমার কোনো আপত্তি নেই।
তুই সব কিছুই বড্ড লেটে বুঝিস্ খুদে। এই জন্যই তোর কিছু হল না। নে ধর্।
থ্যাঙ্কু মেজ্‌কা!
ওয়াক্ ওয়াক্, থুঃ!
আরে কি হলো? অমন করছিস কেন?
এ্যাঃ, এঁটা কী হঁয়েছে? কঁষা-তেঁতো!
মনে হচ্ছে মেজ্‌কা নিজের কোনো গবেষিত বস্তুই খাইয়েছে
হাঃ হাঃ হাঃ, তুই যা ভাবছিস-তা নয়! ওটা হল র-চা। উইদাউট দুধ এণ্ড চিনি।
কেন, তোমার কি ঘরে দুধ চিনি নেই?
ঐ দুধ চিনি দিয়ে তৈরি চা, ভেরি ব্যাড্। চায়ের উপকারিতা পেতে হলে, র-চা পানই শ্রেয়।
আমার মনে হয়, এখানে আর না দাঁড়ানোই শ্রেয়। চলে আয় ডগা।
হুঁঃ, চা ছাড়া যেন আর কোনো পুষ্টিকর পানীয় নেই পৃথিবীতে!

মুক্তা সম্পর্কে দু'চার কথা

তপনকুমার হালদার

পার্ল ওয়েস্টারের ম্যাণ্টলে অবস্থিত মাদার অব পার্ল বা ন্যাকার গ্রন্থি হইতে ক্ষারিত পদার্থ কোন বহিরাগত বস্তুর চতুর্দিকে রিং-এর মত স্তরে স্তরে জমা হইয়া যে উজ্জ্বল চকচকে বস্তুগঠিত হয় তাহাকে মুক্তা বলে।

মুক্তা বিভিন্ন বর্ণের হয়। সাদা, ক্রীম, গোলাপী, বাদামী, নীল, পীত এবং কালো বর্ণের মুক্তা পাওয়া যায়। ইহা সাধারণত পার্ল ওয়েস্টারের খাদ্য, তাপমাত্রা (জলের) এবং অন্যান্য জৈবিক শর্তের উপর নির্ভরশীল। সাধারণত সাদা, ক্রীম, গোলাপী, নীল ও কালোবর্ণের মুক্তার চাহিদা বেশী।

মুক্তার রাসায়ণিক গঠন :

1. ক্যালসিয়াম কার্বনেট (আর্গোনাইট) 99—91%
2. কঙ্কাইওলিন (Conchyolin) 3·8—5·9%
   [$C_{30} H_{18} N_2 O_{11}$]
3. জল (H_2O) 2—4%
4. অন্যান্য পদার্থ 0·1—0·8%

মাছ, চিংড়ির ন্যায় ভারতে বিভিন্ন স্থানে কৃত্রিম উপায়ে মুক্তা চাষ করা হয়। 1975 খ্রীষ্টাব্দে কে. আলাগাস্বামী তুরিকোরিণ কেন্দ্রীয় সামুদ্রিক গবেষণা কেন্দ্রের গবেষক প্রমাণ করেণ, ভারতীয় সমুদ্র জলে মুক্তার বৃদ্ধি জাপানের মুক্তার বৃদ্ধি অপেক্ষা অনেক বেশী।

ভারত	নিউক্লিয়াসের ব্যাস	মুক্তার ব্যাস	চাষের সময় কাল
(মানর)	3mm	3·63 mm	191 Days
জাপান			
(এগোত)	3·05 mm	3·70 mm	730 Days

[মুক্তা চাষ কোথায় প্রথম শুরু হয়েছিল তা জানা না গেলেও রেকর্ড থেকে দেখা যায় যে চীন দেশের বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বীরা প্রথম কৃত্রিম উপায়ে মুক্তা চাষ করেন, তাঁরা সামুদ্রিক ঝিনুকের মধ্যে কৃত্রিম উপায়ে বুদ্ধদেবের মূর্তি খোদিত ছোটছোট প্লেট প্রবিষ্ট করাতেন। সময়ে এগুলি ন্যাকার কর্তৃক আবৃত হইত, পরে এইগুলি সুভেনীর হিসাবে এবং ধর্মীয় প্রতীক হিসাবে বাজারে উচ্চ মূল্যে বিক্রী হত]

প্রথমে আলোচনা করা যাক স্বাভাবিক ভাবে কিভাবে মুক্তা গঠিত হয় (Formation of Pearl in Natural way)।

যেহেতু পার্ল ওয়েস্টার সমুদ্রের তলদেশে জৈব পদার্থে

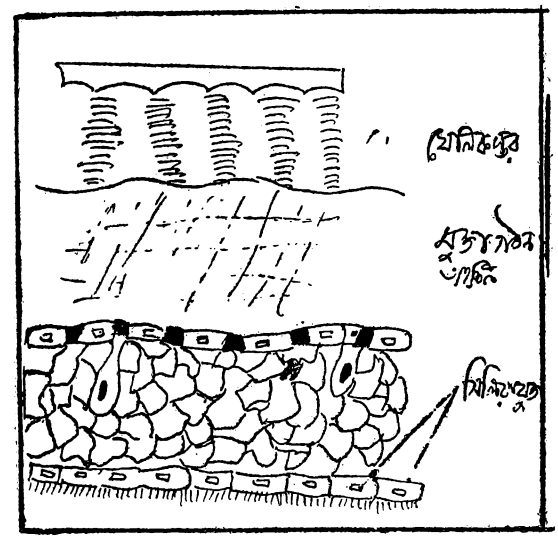

মুক্তা ঝিনুকের প্রস্থচ্ছেদে ন্যাকার গ্রন্থি ও মুক্তা গঠন অঞ্চল

পূর্ণ মৃত্তিকায় অবস্থান করে সেহেতু ইহা যখন খাদ্য অন্বেষণ বা জৈবিক প্রয়োজনে চলাচল করে তখন অনেক অবাঞ্ছিত বস্তু দেহভ্যন্তরে প্রবেশ করে। এই পদ্ধতিতে কোন বালির দানা বা জলজ লার্ভা বা সিষ্ঠ ম্যাণ্টল ও খোলকের অন্তবর্তী স্থানে নীত হয় তখনই মুক্তা গঠনের সম্ভাবনা দেখা যায়। এই অবাঞ্ছিত বস্তু ম্যাণ্টল পর্দার সংস্পর্শে এলে ম্যাণ্টল পর্দায় অবস্থিত ন্যাকার গ্রন্থি উত্তেজিত হয়ে ন্যাকার (Nacre) ক্ষরণ শুরু করে, ন্যাকার এই অবাঞ্ছিত বস্তুর চতুঃপার্শ্বে জমা হতে থাকে। চারি পার্শ্বে ন্যাকার জমা হবার পর ম্যাণ্টল পর্দার সংকোচনে এই বস্তুটি খোলকের গাত্র হতে পৃথক হয়ে যায়। ধীরে ধীরে ন্যাকার ক্ষারিত হয় এবং বস্তুটির চতুস্পার্শ আবৃত করতে থাকে। নির্দিষ্ট সময়ে বস্তুটি বড় হয় গাত্র মসৃন হয়, উজ্জ্বল ও চকচকে হয়, ইহাই মুক্তা নামে পরিচিত।

লোহিত সাগরের ডুবুরিরা এক সপ্তাহে 35,000 পার্লওয়েস্টার সংগ্রহ করে ছিল। মাত্র 21টি মুক্তা পাওয়া গেছিল তার মধ্যে মাত্র 3টির ব্যবসায়িক মূল্য ছিল। ভারতে ডুবুরিদের কোন অর্থ দেওয়া হয় না, কিন্তু মজুরি হিসাবে তারা সংগৃহীত মুক্তার $\frac{1}{8}$ অংশ পায়।

বারুইপুর, নবীনচন্দ্র রোড, 'হালদার নিকেতন'
24 পরগণা (দঃ)।

নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী ডোনাল্ড জে ক্র্যাম

অমরনাথ রায়

1987 খ্রীষ্টাব্দে রসায়ন বিজ্ঞানে যে তিন বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কার লাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন আমেরিকার লস এঞ্জেলেস এ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক 'ডোনাল্ড জে ক্র্যাম'। ভেরমাউন্ট-এর একটি ছোট শহরে (নাম চেস্টার) 1919 খ্রীষ্টাব্দে ক্র্যাম এর জন্ম হয়। পিতামাতার একমাত্র পুত্র ক্র্যাম জন্ম সূত্রে আমেরিকান। মাত্র চার বছর বয়সে ক্র্যাম তাঁর পিতাকে হারান। তাঁর পিতা একাধারে উকিল ও চাষী ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর মা এবং বড় চার বোনই ক্র্যামকে লালন পালন করেন। পনের বছর বয়স পর্যন্ত ক্র্যামকে আর সকলের সঙ্গে পাবিবারিক কাজ কর্ম করতে হতো। ষোল বছর বয়স থেকে ক্র্যাম আর্থিক দিক থেকে স্বাবলম্বী হন। ঐ সময় তিনি ভেরমাউন্ট ছাড়েন। দেশের চারটি বিভিন্ন হাই স্কুলে তিনি পড়াশুনা করেন। ফ্লোরিডায় একটি হাই স্কুলে পড়ার সময় ক্র্যামকে থাকা খাওয়ার জন্যে একটি আইসক্রীমের দোকানে কাজ করতে হতো। আবার নিউইয়র্ক সিটিতে থাকা কালে রাস্তায় বিস্কুট ফেরি করে জীবিকার্জন করতে হতো। নিউইয়র্ক সিটির কাছে লং আইল্যাণ্ডের একটি হাইস্কুলে ক্র্যামের বিদ্যালয় জীবনের শেষ বছর কাটে। ঐ সময় থেকেই ক্র্যাম রসায়ন বিজ্ঞান পড়তে ভালবাসতেন। ফ্লোরিডার রোলিন্স কলেজ যে তিনজন ছাত্রকে জাতীয় স্কলারশিপ দিয়ে পুরস্কৃত করেন, ক্র্যাম তাদের মধ্যে ছিলেন অন্যতম। ছয় হাজার ডলার স্কলারশিপ পাওয়ায় পরবর্তী চার বছর কলেজে উচ্চতর অধ্যয়নে তাঁর খুবই সুবিধা হয়। এ ভিন্ন ঐ চার বছর স্বচ্ছন্দ্যে থাকবার জন্যে তিনি নানা রকম কাজ করে অর্থোপার্জনও করতেন।

1941 খ্রীষ্টাব্দে রোলিন্স কলেজ থেকে স্নাতক হয়ে বেরুবার পর ক্র্যাম মাস্টার্স ডিগ্রী লাভের জন্য আমেরিকার সতেরোটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্থিক সাহায্য চেয়ে আবেদন করেন। কিন্তু মাত্র দুটি বিশ্ববিদ্যায় কর্তৃপক্ষ তাঁকে পড়াশুনায় আর্থিক সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেয়। ক্র্যাম নেব্রাস্কা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত মাসিক পঞ্চাশ ডলার বৃত্তি গ্রহণ করেন।

নেব্রাস্কা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই ক্র্যাম রসায়নে মাস্টার্স ডিগ্রী লাভ করেন এবং তারপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে মার্কআণ্ডকোম্পানীতে পেনিসিলিন ও যুধ নিয়ে কিছুকাল কাজ করেন। এরপর ডক্টরেট ডিগ্রী লাভের জন্যে তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখানে অধ্যাপক রবার্ট বি, উডওয়ার্ড এবং অধ্যাপক পল ডি. বার্টলেট এর অধীনে গবেষণা করে মাত্র আঠারো মাস সময়ের মধ্যেই পি. এইচ. ডি, ডিগ্রী লাভ করেন। এরপর পোস্ট ডক্টরাল ফেলোশিপ নিয়ে অল্প সময়ের জন্যে তিনি ম্যাসাচুসেট্স ইনিস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে যান। 1947 খ্রীষ্টাব্দে ক্র্যাম লস এঞ্জেলেসে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন এবং আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটির ফেলো মনোনীত হন। পরের বছর তিনি ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাসিস্টাণ্ট প্রফেসর রূপে কাজে যোগ দেন। বার্ষিক বেতন তখন তিন হাজার পাঁচশো ডলার। 1950 খ্রীষ্টাব্দে ক্র্যাম প্রফেসরের পদে উন্নীত হন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্র্যাম পড়াতেন জৈব রসায়ন এবং গবেষণাও করতেন জৈব রসায়ন নিয়ে। ক্র্যামের মতে 'অধ্যাপনাই সবচেয়ে সম্মানজনক কাজ। নোবেল পুরস্কার লাভের পরও বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজের চাপ এখনও রয়েছে প্রচুর ; সে কাজগুলি শেষ হলে পর অধ্যাপক ক্র্যামের ইচ্ছা—দেশ ভ্রমণে বেরুবেন, বিশেষ করে তাঁর ভারত দর্শনের ইচ্ছা প্রবল।

ফ্ল্যাট—C-19/2, কালিন্দী হাউসিং এস্টেট, যশোহর রোড, কলকাতা—700 089

সমুদ্রের ঘোড়া

শৈবাল কুমার গুহ

সমুদ্রের ঘোড়া নামটা শুনলে মনে হবে. এবুঝি ঘোড়ার মতো কোনো চতুষ্পদ প্রাণী। আসলে এটি আদৌ সেরকম কোনো প্রাণী নয়, এ হল এক প্রকার সামুদ্রিক মাছ। লম্বায় 1 ইঞ্চি থেকে 1 ফুট পর্যন্ত হতে পারে। সামুদ্রিক মাছের মুখটা দেখতে অনেকটা ঘোড়ার মতো, তাই এর এরকম অদ্ভূত নামকরণ হয়েছে। চীনদেশের লোকেরা আবার এর চেহারার সঙ্গে কাল্পনিক ড্র্যাগনের আকৃতির মিল খুঁজে পেয়েছেন, তাই তাঁরা একে বলেন সমুদ্রের ড্র্যাগন। প্রকৃত পক্ষে এরা মৎস্য শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। অতলান্তিক মহাসাগর, প্রশান্ত মহাসাগর, কৃষ্ণ সাগর এবং ভূমধ্য সাগর প্রভৃতি উষ্ণসাগর অঞ্চলে এদের দেখতে পাওয়া যায়। এদের পঞ্চাশটি প্রজাতি আছে। আকারে ও রঙে এদের মধ্যে নানা বৈচিত্র্য দেখা যায়। ইউরোপের চারিদিকের সমুদ্রে ধূসর রঙের, প্রশান্ত মহাসাগরে কালো রঙের, অস্ট্রেলিয়ার সমুদ্রে সাদাটে রঙের সমুদ্রঘোড়া দেখা যায়। গিরগিটির মতো যখন তখন এরা দেহের রং পরিবর্তন করতে পারে। এর ফলে সমুদ্রের গাছপালা বা প্রবাল প্রাচীরের রঙের সঙ্গে দেহের রঙ মিলিয়ে সহজেই এরা আত্মগোপন করতে পারে।

এই জীবের মাথাটা ঘোড়ার মতো। লম্বা টিউবের মতো প্রলম্বিত নাক, তার প্রান্তে ছোট ছোট দুটি চোয়াল। পেট ক্যাঙারুর মতো। শরীরকে রক্ষা করার জন্য সারাদেহ বর্মাকৃতির 11-টি গোলাকার খোলক দ্বারা আবৃত, যেন মধ্য-যুগের নাইটদের যুদ্ধের ঘোড়া। এই খোলক চিংড়িমাছের খোলার মতো শক্ত। লেজটি নীচের দিকে গুটানো থাকে অনেকটা বানরের লেজের মতো। পিঠের এবং বুকের দিকে পাখনা আছে। পাখনাগুলির সাহায্যে এরা জলে সাঁতার কাটতে পারে।

সমুদ্র-ঘোড়ার সাঁতার কাটার পদ্ধতি খুবই বিচিত্র। এরা গা দুলিয়ে দুলিয়ে জলের মধ্যে চলে। যেন একটি তেজী ঘোড়া টগ্‌বগ্‌ টগ্‌বগ্‌ ক'রে ছুটছে। মাথা খাড়া রেখে যেমন চলতে পারে, তেমনি মাথা নীচের দিকে রেখেও এরা অনায়াসে চলতে পারে। সাঁতার কাটার সময়, বুকের পাখনা পিঠের দিকের পাখনার সঙ্গে সমভাবে আন্দোলিত হয়, অনেকটা হেলিকপ্টারের প্রপেলারের মতো। সমুদ্র-ঘোড়া কোনদিকে যাবে তা মুখের অংশ ঠিক করে দেয়। লেজের

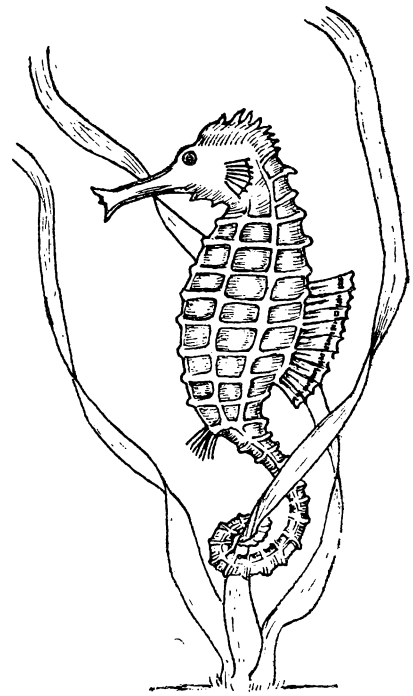

কাজ শরীরকে সোজা করে রাখা। দেহের মধ্যে বায়ুর পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়ে এরা সমুদ্রের জলে ওঠা-নামা করে। মাঝে মাঝে এদের ঝাঁক বেঁধে, বা পরস্পর লেজে-লেজে আটকে, ভেসে থাকতে দেখা যায়। দেহের আকৃতি সাঁতারের উপযোগী নয় বলে এরা তেমন সন্তরণপটু নয়। গুটানো লেজটি থাকাতে এর ভারি সুবিধা। যখন ইচ্ছা জলের নীচে সামুদ্রিক উদ্ভিদে ল্যাজটি জড়িয়ে, সে মনের সুখে বিশ্রাম করে। ছোট ছোট চিংড়ি ও অন্যান্য ক্ষুদ্র জীব এদের খাদ্য। লম্বা টিউবের মতো প্রলম্বিত মুখ ও তার প্রান্তে অবস্থিত চোয়ালের সাহায্যে এরা ক্ষুদ্র প্রাণীদের শিকার করে খায়।

সমুদ্র ঘোড়ার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হ'ল সন্তান ধারণ পদ্ধতি। স্ত্রী সমুদ্র-ঘোড়া সন্তান পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করে না। ক্যাঙারুর পেটে যেমন থলে থাকে, পুরুষ-সমুদ্র-ঘোড়ার পেটের ওপর থাকে সেই রকম একটি থলের মতো অঙ্গ। স্ত্রী-সমুদ্র ঘোড়া একসঙ্গে প্রায় 200 ডিম পাড়ে। সে ডিমগুলি পুরুষ

সমুদ্র-ঘোড়ার থলির মধ্যে রেখে দেয়। পুরুষ সমুদ্র-ঘোড়া ডিম অবস্থা থেকেই সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করে। পুরুষ সমুদ্র-ঘোড়া ডিমে তা দেয়। যথা সময়ে ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়। একটু বড় এবং শক্তসমর্থ না হওয়া পর্যন্ত, তারা বাবার থলির মধ্যে বসবাস করে। সেখানে অনেক রক্তজালিকা থাকে। তা থেকেই এদের দেহের পুষ্টি সাধিত হয়। কিছুকাল পরে এরা যখন পূর্ণতা লাভ করে, এবং যথেষ্ট সবল হয়, তখন এই আরামের কুঠুরি থেকে বেরিয়ে আসে, এবং খাদ্যের সন্ধানে চলাফেরা করতে আরম্ভ করে কিন্তু প্রথম প্রথম বাবার দৃষ্টির বাইরে বেশীদূর যায় না। পুরুষ সমুদ্র-ঘোড়াও তখন তার সন্তানদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখে। এই সময় এরা অত্যন্ত ভীতু এবং সন্ত্রস্ত থাকে। সামান্য ভয় পেলেই তারা বাবার থলের মধ্যে ঢুকে আশ্রয় নেয়। ক্যাঙারু শাবক যেমন বিপদের সম্ভাবনা দেখলেই ছুটে এসে তার মায়ের পেটের থলিতে লুকিয়ে পড়ে, এবং মাথাটা একটু বের করে চেয়ে থাকে, এদের আচার-ব্যবহারও অনেকটা সেইরকম।

সমুদ্র-ঘোড়া খুবই নিরীহ প্রকৃতির প্রাণী। একে অনায়াসে পোষ মানানো যায়। সমুদ্র থেকে তুলে এনে, অ্যাকোয়ারিয়ামে রেখে এদের লালন পালন করা যায়। পালককে এরা বন্ধু বলেই মনে করে। এজন্য পৃথিবীর অনেক দেশেরই অ্যাকোরারিয়ামে সমুদ্র-ঘোড়াকে দর্শনীয় বস্তু হিসাবে রাখা হয়।

5/3A, ওলাই চণ্ডী রোড কলিকাতা-37।

চিত্র থেকে লিপি

কার্তিক ঘোষ

জন্মেই তো কথা বলতে শিখেছে মানুষ। কিন্তু কথাটাকে লেখায় সাজাতে সময় লেগেছে অনেক। আবার ছবি দিয়ে লেখা শুরু করতেও কম ঝক্কি সামলাতে হয়নি মানুষকে। লেখার চেয়ে তাই আঁকি বুকির বয়েসটা অনেক বেশি। মাত্র পাঁচ হাজার বছর আর এমন কি। মানুষ লিখতে শিখেছে যখন থেকে তারও প্রায় কুড়ি হাজার বছর আগে হাতে খড়ি হয়েছে তার আঁকায়।

আদিম মানুষের হাতে তখন শুধু ছবি আর ছবি। ছবি দিয়েই তারা প্রকাশ করে মনের ভাব। পণ্ডিতেরা বলেন চিত্রলিপি। তা বলুন। আমরা জানি আদ্যিকালের মানুষ কত রকম ছবি এঁকে রেখে গেছেন আমাদের জন্যে। সেই সময়ের অনেকগুলো গুহাচিত্র ফ্রান্সে আর স্পেনে আবিষ্কারও হয়েছে।

ক্যালেণ্ডারের পাতায় তখন 1879। সাউটুওলা নামে এক প্রত্নতত্ত্ববিদ থাকতেন স্পেনে। আলতামিরার গুহাটা তাঁর বাড়ির কাছেই। ছোট মেয়েকে নিয়ে একদিন ঢুকে পড়লেন সেই গুহায়। মাথা হেঁট করে তিনি খুঁজছিলেন পাথর। হঠাৎ মোমবাতি হাতে চেঁচিয়ে উঠল ছোট মেয়েটি। টেরো—টেরো।

টেরো কথাটার মানে হচ্ছে ষাঁড়। সাউটুওলা মাথা উঁচু করে কিছু দেখবেন তার উপায় নেই। নিচু হয়ে বসেই গুহার ছাদের দিকে চেয়ে দেখলেন বড় বড় বাইসনের ছবি। সঙ্গে আরো কত জন্তু জানোয়ার। গুহার গায়ে আঁকা সেই সব ছবির বয়স কম করে পঁচিশ হাজার বছর।

আলতামিরাই যেমন গুহাশিল্পের প্রথম আবিষ্কার নয়, তেমনি চিত্রলিপির ইতিহাসে সুমেরীয়রাই প্রথম নয়, পিরামিড আর মমির দেশ মিশরেও লিপির প্রচলন হয়েছিল একই সময়। খ্রীস্টের জন্মের প্রায় তিন হাজার বছর আগেকার কথা সে সব।

কিন্তু তখনও পর্যন্ত চিত্রলিপির সঙ্গে কথার যোগ ছিল না মানুষের। ছবিও আঁকত এক একজন এক একরকম। সেই নিয়েও একবার কি ঝামেলা।

আজকের ইরান দেশটারই পুরনো নাম পারস্য। সেখানেরই রাজা ছিলেন দারাউস। তিনি এক সময় রাশিয়ার দক্ষিণ দিকে সাইথিয়া নামে দেশটা আক্রমণ করে বসলেন। সাইথিয়ানরা সহজে ছাড়বে কেন? তারাও দূতের হাতে একটা ছবি এঁকে পাঠাল। কাগজে পরিষ্কার আঁকা হলো একটা পাখি, একটা ব্যাঙ, একটা ইঁদুর আর তিনটে তীর।

দারাউস ভুল মনে করে ঘুমিয়ে ছিলেন নিশ্চিন্তে। সেই রাতেই সাইথিয়ানরা আক্রমণ করল দারাউসকে। তখন ছবির মানেটা পরিষ্কার হলো রাজার কাছে। তিনি বুঝতে পারলেন, ছবি এঁকে বলা হয়েছে পারস্য সম্রাট এবং তাঁর সৈন্যরা যদি পাখির মত উড়ে না পালায়, ইঁদুরের মত গর্তে না ঢোকে, ব্যাঙের মত জলের তলায় না লুকোয় তাহলে সাইথিয়ানদের ধারালো তীরের ফলায় কারো নিস্তার নেই।

চিত্রলিপির ইতিহাসে মানুষের এমন ভুল অবশ্য বেশি দিন হয়নি। ছবির একটা ধাঁচ তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল লেখার জন্যে। সেসব হচ্ছে লিপি আবিষ্কারের গোড়ায় গল্প। আরেকদিন বলব।

কুড়কুড়ি, তাঁতিশাল, হুগলি।

॥ ছয় ॥

আপ্পাইয়াকে অনুসরণ করে বাগানে পেয়ারা গাছের তলায় এল সুবীর। সেখানে শুয়েছিলেন ডক্টর হার্ট্‌জ এবং তাঁর মুখে চোখে জলের ঝাপটা দিচ্ছিল করবী।

উঠে বসলেন ডক্টর হার্ট্‌জ। করবীর হাত থেকে তোয়ালে নিয়ে মাথা ও মুখ মুছে বললেন, আমি এখন ঠিক আছি, আপনাদের গাড়ি করে আমাকে কৃষ্ণরাওয়ের ওখানে পৌঁছিয়ে দিন দয়া করে।

নিশ্চয়ই। সুবীর বললে, 'তার আগে এক কাপ কফি খেয়ে নিন। আসুন, বাগানের ঐ বেঞ্চিটাতে উঠে বসুন...'

বেঞ্চিতে বসে মৃদুমন্দ হাসতে হাসতে ডক্টর হার্ট্‌জ বললেন, 'ধাক্কা মেরে আমাকে একেবারে শুইয়ে দিয়েছে বনমানুষটা। তবে সে আর আপনাদের বাগানে নেই, বাগান ছেড়ে সী-বিচ্‌-এর দিকে চলে গিয়েছে। স্লাইডের বাক্সটা অবশ্য পারিনি ওর কাছ থেকে উদ্ধার করতে। ওটাকে লস্ট্‌ বলেই ধরে নিন।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে সুবীর বললে, 'যা যাবার তা গিয়েছে কাজেই কি আর করা যাবে'।

'ওটার জন্য অনুশোচনা করবেন না'। ডক্টর হার্ট্‌জ বললেন, 'স্লাইড্‌গুলোর মধ্যে যে সব স্পোর আছে, তারা বাতাসে ভেসে বেড়ায়, মাদ্রাজ এবং মাদ্রাজের আশেপাশে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জুড়ে তারা ছড়িয়ে আছে। তাদের চিনে নিয়ে খুনীকে চিনে নিতে পারবেন বলে আমার মনে হয় না'।

করবী বললে, 'বাতাসে ভেসে বেড়ানো স্পোরের সঙ্গে কিছু কিছু ভিন্ন ধরণের স্পোরও আছে, যা এদেশে দেখা যায় না।

'ভিন্ন দেশের স্পোর বাতাসে ভেসে এদেশে এসে পৌঁছেছে মিসেস সিন্‌হা। বাতাস তো আর দেশের সীমা মানে না।

ইতিমধ্যে কফি নিয়ে এল আপ্পাইয়া। কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে ডক্টর হার্ট্‌জ্‌ বললেন, মাদ্রাজ থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলের বাতাসে রকমারি বিদেশী স্পোর ভেসে বেড়ায়, হয়তো তাদেরই কিছু কিছু এই স্লাইড্‌গুলোতে দেখেছেন আপনারা।

সুবীর বললে, 'কবে আপনি কন্যাকুমারী ফিরে যাবেন ডক্টর হার্ট্‌জ্‌?'

'আজই। ডক্টর হার্ট্‌জ্‌ জবাব দিলেন।

'বন মানুষটাকে তো আপনি ধরতে পারলেন না ডক্টর হার্ট্‌জ্‌, আবার তার ফিরে এসে উপদ্রব করার আশঙ্কা রয়ে গেল।'

'না, সে আর ফিরে আসবে না।'

অবাক হয়ে কয়েক মুহূর্ত ডক্টর হার্ট্‌জ্‌-এর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে সুবীর বললে, কি ক'রে বুঝলেন যে সে আর ফিরে আসবে না।

'কি ক'রে বুঝলাম তা' আমি বুঝিয়ে বলতে পারব না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন ডক্টর সিন্‌হা, সে আর ফিরে আসবে না'

সত্যিই সে আর ফিরে এল না। সপ্তাহখানেক বাদে কন্যাকুমারী থেকে ডক্টর হার্ট্‌জের চিঠি এল। তিনি লিখেছেন, 'বনমানুষটাকে আমি ঠিকই বুঝেছিলাম, তাই না? সে আর আপনাদের ওখানে যায় নি, যাবেও না কখনো। পুরোপুরি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন আপনারা।

উত্তরে সুবীর লিখল, 'বনমানুষটাকে ধরতে না পারলেও তার স্বভাব-চরিত্র ঠিকই ধরেছেন আপনি। আমাদের স্লাইড-বক্সটা নিয়ে পালিয়ে গিয়ে আর সে ফিরে আসে নি। এখন প্রশ্ন সে গেল কোথায়? ওরাং ওটাং তো বাঁদর বা হনুমান জাতীয় জীব নয় যে সে কারুর নজরে না এসে পালিয়ে বেড়াবে। জলজ্যান্ত একটা ওরাং ওটাং এদেশের যে কোনও জায়গায় মানুষের দৃষ্টিতে না এসে যায় না।

অতএব আমার মনে হচ্ছে যে ঐ ওরাং ওটাংটা সমুদ্রের ধারে কোন পাহাড়ের গুহায় বা জঙ্গলে লুকিয়ে আছে। অবশ্য এমনও হতে পারে যে দ্বিতীয় কোন ওরাং ওটাং নয়, আপনার ওরাং ওটাংটাই এসেছিল। আপনি আপনার কাছে ওকে এনে রাখলেও সেদিন রাত্রে আপনি যখন ঘুমিয়েছিলেন, তখন সে এসেছিল আমাদের এখানে এবং ভোর হবার আগেই ফিরে গিয়েছিল আপনার কাছে। পরে আপনি যখন আমাদের ল্যাবোরেটারিতে এলেন, তখন সে-ও এসেছিল আপনাকে অনুসরণ করে এবং স্লাইড্ বক্সটা নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। আপনি তার কাছ থেকে বাক্সটা উদ্ধার করার চেষ্টা করতেই সে আপনাকে ধাক্কা মেরে অজ্ঞান করে দিয়েছিল...'

'আমার পোষা ওরাং ওটাং আমাকে ধাক্কা মেরে অজ্ঞান করে ফেলে দেবে তা কি কখনো সম্ভব! উত্তরে ডক্টর হার্ট্জ্ লিখলেন, 'নিঃসন্দেহে ওটা আর একটা ওরাং ওটাং। দ্বিতীয় এই ওরাং ওটাংয়ের অস্তিত্ব সম্পর্কে তোমার মনের সন্দেহ দূর করার জন্য তোমাকে জানাই যে এই দ্বিতীয় ওরাং ওটাংটাকে আমি ধরে ফেলেছি এবং আমার ল্যাবোরেটারির লাগোয়া একটা ঘরে রেখেছি। কৃষ্ণরাওকে খবর দিয়েছি, সে শিগ্গিরই এটাকে এখান থেকে তার চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করবে। ওরাং ওটাংটাকে ধরলেও তোমাদের স্লাইডের বাক্সটা পাইনি, ওটা বোধ হয় সে ফেলে দিয়েছে।'

ডক্টর হার্ট্জ্-এর এই চিঠি পাওয়ার পর কৃষ্ণ রাওয়ের কাছে গেল সুবীর ও করবী। কৃষ্ণরাও তখন কন্যাকুমারী যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছেন। তিনি বললেন, ডক্টর হার্ট্জ্-এর নির্দেশ মত যাচ্ছি ও'র ল্যাবোরেটারিতে ঐ ওরাং ওটাংটাকে ধরে আনতে। মার্সেডিজ ট্রাক নিয়ে যাচ্ছি —

করবী বললে, 'ওটাকে এখানে না আনলেই পারতেন মিস্টার কৃষ্ণরাও। ও তো আর আপনার এখানকার ওরাং ওটাংটার মত শান্তশিষ্ট নয়! আমাদের এখানে কি রকম হামলা করেছিল ও, তা তো আপনি জানেনই—রাত্রে, আমাদের শোবার ঘরে পর্যন্ত ঢুকে পড়েছিল —'

কোন ভয় নেই, আপনাদের, ওকে খাঁচা থেকে বেরোতেই দেব না—

তিন দিন বাদে ফিরে এলেন কৃষ্ণরাও। ফিরে এসেই দেখা করলেন সুবীর ও করবীর সঙ্গে।

'ওরাং ওটাংটাকে ধরে নিয়ে এসেছেন তো?' সুবীর প্রশ্ন করলেন।

'না'। কৃষ্ণরাও জবাব দিলেন, 'ট্রাক ও লোহার খাঁচা নিয়ে আমার যাওয়াই বৃথা হ'ল। আমরা ওখানে পৌঁছাবার আগেই ওরাং ওটাংটা মারা যায়। তাকে সমুদ্রের জলে ফেলে দিয়েছেন ডক্টর হার্ট্জ্—'

'যাক্ বাঁচা গেল! করবী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললে।

সুবীর বললে, 'খুবই দুঃখের কথা! আজই ডক্টর হার্ট্জ্কে একটা কণ্ডোলেন্স্ মেসেজ পাঠিয়ে দেব।'

কৃষ্ণরাও বললেন, 'কন্যাকুমারীর কেউই কিন্তু এই বনমানুষটাকে চোখে দেখেনি। তাঁর সহকারী কার্লও না। তার মানে ডক্টর হার্ট্জ্ ওকে ধরে নিজের কটেজে আটকে রেখেছিলেন এবং নিজেই তার দেখাশুনা করতেন। এই ওরাং ওটাংটা আমার এখানে যেটাকে তিনি রেখে গিয়েছেন তার তুলনায় বেশি হিংস্র ছিল বলেই হয় তো তিনি তাকে আড়ালে রেখেছিলেন।'

করবী বললে, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে ওরকম একটা হিংস্র বনমানুষকে আপনার চিড়িয়াখানায় আনতে হ'ল না।'

'আমার কিন্তু খুব দুঃখ হচ্ছে।' কৃষ্ণরাও বললেন, 'যে কোনও হিংস্র প্রাণীকে আমি বশ করতে ও পোষ মানাতে জানি। আমার এখানে যে সব বাঁদর, হনুমান ও বনমানুষ আছে, স্বভাবে তারাও কম হিংস্র নয়, তাদের সবাইকে আমি শাসনে রেখেছি। আমার বিশ্বাস এই দ্বিতীয় ওরাং ওটাংটাকেও আমি পুরোপুরি বশ করতে পারতাম।

'ডক্টর হার্ট্জের নতুন মাইক্রোস্কোপের কি খবর মিস্টার রাও? সুবীর প্রশ্ন করল।

মাইক্রোস্কোপের কথা কিছু বলেন নি ডক্টর হার্ট্জ্। কৃষ্ণরাও জবাব দিলেন, 'ওরাং ওটাংটার মৃত্যুতে খুব বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন কি না, অন্য কোন প্রসঙ্গে কোন কথাই বলেন নি তিনি।

কৃষ্ণরাও চলে যেতেই এলেন ভেংকটরাজন। পকেট থেকে একটা ক্যাসেট বের করে তিনি বললেন, 'পুরুষোত্তমের ঘরে একটা টেপ রেকর্ডার ছিল, আশা করি আপনার নজরে এসেছে তা?

'হ্যাঁ।' সুবীর জবাব দিল, 'ও'র ঘরের ড্রেসিং টেবিলের ওপরে রাখা ছিল।'

'পুরুষোত্তমের আলমারির মধ্যে অনেকগুলো ক্যাসেট আছে। প্রত্যেকটির গায়ে লেখা আছে তাতে কি রেকর্ড করা আছে।

'গান-বাজনা রেকর্ড করা আছে বুঝি?'

'না। সব ব্যবসায়িক কথোপকথন, খদ্দেরদের সঙ্গে তাঁর আলাপ-আলোচনা। খুব হুঁশিয়ার রত্ন ব্যবসায়ী ছিলেন পুরুষোত্তম। একটা ক্যাসেট্ তাঁর টেপ-রেকর্ডারের মধ্যে ছিল, এটা সেই ক্যাসেট্।

বলে ক্যাসেটটা সুবীরের দিকে এগিয়ে দিলেন ভেংকটরাজন।

সুবীর বললে, 'পুরুষোত্তম ডক্টর হার্ট্জ্কে যে হীরে,

বেচেছিলেন এতে হয়তো তার সম্বন্ধে কথাবার্তা আছে। হয়তো দর কষাকষি হয়েছিল। নরসিংহমূর্তি বলেছিলেন যে সেদিন রাত্রে দুজনের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা হয়েছিল। এই ক্যাসেটে নিশ্চয়ই সেই সব কথাবার্তা রেকর্ড করা হয়েছিল। এই কথোপকথনের মধ্যে খুনীর হদিস কি মিলতে পারে?'

'হয়তো পারে।' ভেংকটরাজন বললেন, 'কিন্তু তার জন্য কথোপকথনটি শোনা দরকার।

প্লেয়ারে দিয়ে বাজান না। এই যে আমার ক্যাসেট প্লেয়ার আপনার হাতের কাছেই আছে...'

'আপনি বাজান ডক্টর সিনহা—আপনার প্লেয়ার, আপনিই প্লে করুন।

'প্লে' করে সুবীর। কিন্তু প্লে করতেই যা শোনা গেল তাতে চমকে ওঠে তিনজনেই।

রেকর্ডারে বেজে ওঠে পুরুষোত্তমের মৃত্যু—আর্তনাদ।

আর্তনাদ থামার পর সুবীর বললে, 'ব্যাস্, আর কিছু নেই।'

'আর কিছু নেই কি বলছ!' করবী বললে, 'একটা অস্পষ্ট স্বরও বেজে চলছিল। শুনতে পাও নি?'

'অস্পষ্ট স্বর! কিসের অস্পষ্ট স্বর! সুস্পষ্ট পুরুষোত্তমের আর্তনাদ ছাড়া আর কিছুই নেই। কিন্তু আমার প্রশ্ন কে এটা রেকর্ড করল?'

'কে আবার করবে!' ভেংকটরাজন বললেন, স্বয়ং, খুনীই করেছে!'

সুবীর বললে, 'আমার তা, মনে হয় না। খুনী কখনো করতে পারে না এ কাজ।'

আমাদের নৃসিংহ অবতার ছাড়া আর কেউ তো ছিল না ফ্ল্যাটের মধ্যে, হয় পুরুষোত্তম, নয়তো সে দুজনের একজন করেছে এ কাজ।'

'নরসিংহমূর্তি যদি এ কাজ করে থাকে, সে খুনী নয়। পুরুষোত্তমের পক্ষে এ কাজ করা সম্ভব নয়, কারণ সে খুন হয়েছে ...' [চলবে]

জেনে রাখা ভাল

বিবর্তনের ধারায় মানুষ ও অবতার

ভারতীয় পুরাণে বিষ্ণুর অবতারের কথা আছে। তবে সব পুরাণে অবতারের সংখ্যা নির্দিষ্ট নয়। মহাভারতের তিন জায়গায় তিনটি সংখ্যার উল্লেখ আছে চার, ছয়, এবং দশ। অন্যান্য পুরাণে আরও বেশী এবং অর্বাচীন পুরাণগুলোতে অবতারের সংখ্যা একশকেও ছাড়িয়ে গেছে। অনেকের মতে প্রাথমিক অবতারবাদের মধ্যে একটা বিশেষ বৈজ্ঞানিক মতবাদ রূপকের আকারে ব্যক্ত করা হয়েছে।

অবতারবাদ ভারতের নিজস্ব। কারও কারও মতে ভারতের আর্য ঋষিরা কল্পনা করেছেন। আবার ডঃ সুনিতি কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ভাষাতাত্ত্বিকদের ধারণা, আর্যদের পূর্বে পূর্বে ভারতের আদিম অষ্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর বাসিন্দারা কল্পনা করছিলেন। পরে দার্শনিক আর্য ঋষিরা গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের কাছ থেকে।

মহাভারতের অবতারদের নাম যেভাবে সাজানো হয়েছে তাতে কিন্তু কিছুটা ত্রুটি চোখে পড়ে প্রথম অবতারের কল্পনায়। শঙ্করাচার্য ও ভক্তকবি জয়দেবের কল্পনাই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাঁদের দশ অবতারের প্রথম 6টি মানুষের বিজ্ঞানের ধারাটিকে পূর্ণ সমর্থন করে। ঐ 6টি অবতার যথাক্রমে মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন ও পরশুরাম। প্রথম মৎস্য অবতার—জলমগ্ন পৃথিবরী বুকে প্রথম মেরুদণ্ডী প্রাণী মাছ। দ্বিতীয় কূর্ম আদি উভচরদের প্রতীক, তৃতীয় বরাহ জল কাদায় মধ্যে পৃথিবীর বুকে দুর্যোগময় যুগে আদিম স্তন্যপায়ী, চতুর্থ নৃসিংহ অর্ধ-বানরাকৃতি—মাথা ভর্তি চুল যুক্ত মানুষ—যারা আসুরিক ক্ষমতাসম্পন্ন সুবৃহৎ জন্তু জানোয়ারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জীবনযুদ্ধে জয়ী হয়েছিল। পঞ্চম বামন—সেই বেঁটে খাটো কুঁজো নিয়ানডার্থাল মানুষ, ষষ্ঠ পরশুরাম হচ্ছেন আধুনিক ক্রোম্যাগনন মানুষ—যাঁরা পাথরের হাতিয়ার এবং আগুনের সাহায্যে অরণ্যের অতি ভয়ঙ্কর ও হিংস্র জন্তুদের ধ্বংস করে সারা পৃথিবীতে অধিকার স্থাপন করেছিলেন। পরবর্তী চার অবতারের মধ্যেও বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে। হলধর আদি কৃষি-সভ্যতার প্রতীক, রাম গোষ্ঠী পতি উদ্ভবের দিনে আদিমরাজা, বুদ্ধ সমদর্শী বিজ্ঞানী মানুষ—যাঁরা বুঝতে পেরেছেন ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ থেকে মানুষ—সবার সঙ্গে আছে নিবিড় যোগ, আর কলি—তিনি পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্রে বলবান হয়ে পৃথিবীর বুকে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন করবেন কিনা কে জানে?

আমরা জানি, গ্রীক দর্শনের মধ্যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান নিহিত ছিল। ডারউইনের দেড় হাজার বছর আগে ভারতীয় দর্শনে বিবর্তনবাদ ধরা পড়েছিল কিনা—তা আর গবেষণা হলো না।

কেমন আছে টাইটানিক

আশিস মান্না

কত বছর—এক শতাব্দীর তিন-চতুর্থদংশ পার হয়ে গেল, টাইটানিক সমুদ্রের তলায় শুয়ে আছে। সেই জায়গাটা কোথায়, তা খুঁজে পাওয়া গেল মাত্র কয়েক বছর আগে, উনিশশো পঁচাশিতে, ফরাসী-আমেরিকান যৌথ প্রচেষ্টায় এই অভিযানের নেতা ডঃ রবার্ট ব্যালার্ড—ম্যাসাচুসেট্‌সের উডস্‌হোল ও সেনোগ্রাফিক ইন্‌স্টিটিউটের বর্ষীয়ান, অভিজ্ঞ বিজ্ঞানী। অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ গোপন রেখে উনি সংবাদ মাধ্যমকে তখনই খবরটা জানিয়েছিলেন—সঙ্গে দেখিয়েছিলেন স্বয়ং চালিত ডুবোজাহাজ থেকে তোলা কিছু ছবি। কেউ বিশ্বাস করেছিল, কেউ করেনি।

গত 1986-র জুলাই মাসের 13 তারিখে ডঃ ব্যালার্ড আবার গেলেন টাইটানিক—এবার সশরীরে—উচ্চচাপসহ ডুবোজাহাজ 'অ্যালভিন'-এ চড়ে—সঙ্গী পাইলট র‍্যালফ হোলিস এবং কো-পাইলট ডাডলে ফস্টার। এবারের অভিযানের খরচ ও প্রয়োজনীয় সাহায্য জোগাল আমেরিকার নৌবাহিনী।

3800 মিটার জলের তলায় যখন ব্যালার্ড প্রথম কালো ছায়ার মত টাইটানিকের খোলটি 'আবিষ্কার' করলেন, তখন বয়ে যাওয়া সময়ের ভারি যবনিকা যেন তুলে নেবার লক্ষণ দেখা গেল। জাহাজটি তৈরি হবার পর যেমন হাজার হাজার দর্শনার্থী এটিকে দেখতে আসত, তেমনি ডুবে যাওয়ার পরও 'দর্শনার্থী'-র বিরাম নেই—সেই স্রোতের প্রথম তিন প্রতিনিধি উপস্থিত।

মোট 12 দিন ধরে 'অ্যালভিন'-এ করে এই তিনজন পাড়ি দিলেন টাইটানিকে—শেষের ক'দিন সঙ্গে ছিলেন মার্টিন বাওয়েন—ইনি 'আণ্ডারওয়াটার রোবট' বিশেষজ্ঞ—চালনা করেছিলেন ক্ষুদ্রাকৃতি 'জুনিয়ার জ্যানস' (সংক্ষেপে জে. জে.) রোবটটিকে, 'জে. জে.' মূলত ছবি তুলছিল মুভি ও স্টিল ক্যামেরায়; যেখানে বিরাট চেহারার অ্যালভিন ঢুকতে পারেনি, জে.জে তার ছোটখাট, হাল্কা শরীর নিয়ে অনায়াসে দেখে আসছিল সেইসব জায়গা।

টাইটানিক ডোবার পর সমুদ্রতলে পৌঁছেছিল দ্রুতবেগে ধাবমান একটি রেল ইঞ্জিনের গতি দিয়ে—তাই সঙ্গে সঙ্গে নরম কাদায় গেঁথে গিয়েছিল। এখন টাইটানিকের প্রায় কুড়ি মিটার ঢুকে আছে সেই কাদায়। ইস্পাতের তৈরি খোলে তীব্র ক্ষয়কারী সমুদ্রজল তার দাঁত বসিয়েছে, মরচে পড়ে জীর্ণ হয়ে গেছে তা—আর সেই মরচে খসে খসে পড়েছে প্রায় বার মিটার জুড়ে। নোঙর, বিরাট মোটা মোটা শেকল আর ক্যাপস্টান রয়ে গেছে অবিকৃত প্রায়—কারণ বেশির ভাগই ছিল ব্রোঞ্জের তৈরি। পঁচাত্তর বছরে কাঠের কাজ আর অক্ষত নেই—ভঙ্গুর হয়ে গেছে, চলে গেছে সামুদ্রিক শামুকের পেটে।

অনেক খুঁজে সন্ধান পেতে হয়েছিল দুটো চিমনীর—তেইশ মিটার উঁচু বিশালকায় চিমনী এখন কয়েকটা ধাতুর টুকরো হয়ে ছড়িয়ে আছে ডেকের আশোপাশে।

অ্যালভিন হঠাৎ ধাক্কা খেয়েছিল লাইফবোট নামানোর মঞ্চ—'ডেভিট'-এ, এতটাই আবেগ তাঁকে ছেয়ে রেখেছিল যে, ব্যালার্ড বলেছেন—'আমার মনে হয়েছিল—কারা যেন চিৎকার করে বলছে—নারী আর শিশুদের প্রথমে নামতে দিন!'

জে জে-কে ঢুকিয়েদেওয়া হয়েছিল জাহাজের ভেতরে—যতদূর যেতে পারে বাধাহীনভাবে। বিস্মিত হয়ে বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছিলেন ফার্স্ট ক্লাস বলরুমের একটা ঝাড়লণ্ঠন কেমন করে যেন অটুট রয়ে গেছে—ঐ ধাক্কার চোট সামলে। রেস্তোরাঁ-তে ছড়ানো চীনামাটির প্লেট, রূপোর ট্রে, গ্লাস, বাটি, মদের বোতল, প্রায় নষ্ট হয়ে যাওয়া জুতো—আরও কত কি।

অভিযানের দিনগুলো কেমন যেন তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল। আসবার আগে, জাহাজের পেছন দিকে গলুইয়ের ওপর অভিযাত্রীরা রেখে এলেন একটা ফলক—নিহত প্রায় দেড়হাজার যাত্রীর স্মৃতিতে।

সহায়তা—

1. দ্য ডিসকভারি অব দ্য টাইটানিক—ডঃ রবার্ট ব্যালর্ড,
2. এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা—1986.
3. এনসাইক্লোপিডিয়া আমেরিকানা—1987.

স্যার নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ স্টুডেন্টস্ হোস্টেল কলকাতা—700014.

ডাঃ রবি রায়ের বক্তৃতা

নিরঞ্জন সিংহ

গতকাল ডঃ রবি রায়ের সঙ্গে মেক্সিকো সিটি শহরে এসে পৌঁছেছি। কয়েকদিন বাদে এখানে এক বিরাট বিজ্ঞান অধিবেশন শুরু হচ্ছে। আমি একজন বিজ্ঞান-সাংবাদিক। এই সুদূর দেশে আসার উদ্দেশ্য বিজ্ঞান-অধিবেশনকে কভার করা। কাগজের সম্পাদক মশায় আমাকে এত খরচপত্র করে পাঠাতেন কিনা সন্দেহ। কারণ কোন বিজ্ঞান-অধিবেশন কভার করার কোন দায়িত্ব কোন দৈনিক সংবাদপত্রের আছে বলে কোন সম্পাদকই মনে করেন না। আমার মেক্সিকো সিটি আসার পিছনে রয়েছে ডঃ রবি রায়ের হাত।

ডঃ রবি রায়ের পরিচয় নতুন করে দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। বৈজ্ঞানিকমহল থেকে সাধারণ মানুষও এই আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মানুষটির নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। মেক্সিকো সিটির বিজ্ঞান-অধিবেশনে ডঃ রবি রায়ও আমন্ত্রিত হয়েছেন। কথাটা ওঁর মুখ থেকেই শুনলাম আমি। এত বিখ্যাত বিজ্ঞানী এবং যথেষ্ট ব্যস্ত মানুষ হওয়া সত্ত্বেও উনি আমার মত একজন সাধারণ সাংবাদিককে বড্ড ভালবাসেন। এ আমার পরম সৌভাগ্য। আমার বিজ্ঞান সাংবাদিক হিসেবে একটু নামটাম করার পিছনে ডঃ রায়ের অবদান সব চাইতে বেশি।

প্রথম জীবনে, আমি যখন এ কাগজ ও কাগজে পপুলার সায়েন্সের ফীচারটিচার লিখতাম, সেই সময় হঠাৎ এক বিজ্ঞান-পত্রিকার সম্পাদক বললেন যে আমি যদি ডঃ রবি রায়ের একটা সাক্ষাৎকার জোগাড় করতে পারি তাহলে উনি সাগ্রহে তা ওঁর কাগজে ছাপবেন এবং একটু ভাল সম্মান দক্ষিণাও দেবেন।

ডঃ রবি রায় সম্পর্কে তখন আমি বিশেষ কিছু জানতাম

না। তবে এইটুকু শুনেছিলাম নোবেল পুরস্কারের জন্য ও'র নাম ওঠার সম্ভাবনা যথেষ্ট। যাহোক অল্প বয়সে সাহসটা একটু হয়তো বেশিই থাকে। ব্যাপারটা আমার কাছে একটা চ্যালেঞ্জ বলে মনে হল। বিশেষ কিছু ভাবনাচিন্তা না করেই ডঃ রবি রায়ের বাড়ি গিয়ে একদিন হাজির হলাম।

আমাকে বসতে বলে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ব্যাপার?' আমি ও'কে সব কথা খুলে বললাম।

'সাক্ষাৎকার!' আমার সবকথা শুনে যেন একটু বিব্রত হয়ে কথাটা উচ্চারণ করলেন ডঃ রবি রায়।

আমি একটু দমে গেলাম। ভাবলাম এবার বোধহয় না করে দেবেন। কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে বলে উঠলেন, 'আজ তো হবে না। তুমি এক কাজ করো-আগামী রবিবার সকাল দশটায় চলে এসো।

আমি কৃতার্থ হয়ে নমস্কার করে উঠে পড়লাম। এবং পরের রবিবার ডঃ রায়ের বাড়ি গেলাম সময়মত। সেই শুরু। সাক্ষাৎকার নেওয়া কাকে বলে তার কিছুই তখন ভাল জানতাম না। ডঃ রায় আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করলেন সাক্ষাৎকার নেওয়ার ব্যাপারে। সেই সাক্ষাৎকার পেয়ে সম্পাদকমশাই তো প্রায় লাফিয়ে উঠলেন। ছাপা হল পরের সংখ্যায়। আমারও একটু নামটাম হল। কিন্তু এরপর থেকে ডঃ রবি রায় আমাকে যে কী চোখে দেখলেন তা ভগবানই জানেন। আমি হয়ে গেলাম ও'র ভক্ত শিষ্য। আমার বহু লেখায় যে ও'র কলমের ছোঁয়া আছে তা অনেকেই জানেন না।

যাহোক আসল কথায় আসি। এই অধিবেশনে আসার জন্য আমার সম্পাদক মশাইকে বলে দিলেন উনি। তাতেই কাজ হল। পাশপোর্ট করাই ছিল; ভিসা, প্লেনের টিকিট আর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে ফরেন এক্সচেঞ্জের সব ব্যবস্থাই সুষ্ঠুভাবে করে দিলেন অফিসের এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়।

কলকাতা থেকে রওনা হওয়ার দুদিন আগে ডঃ রায় যা বললেন তা শুনে সাদা কথায় আমার পিলে চমকে উঠল। আমার কোন ধারণাই ছিল না যে বিজ্ঞানী মহলেও এরকম হিন্দি সিনেমার ভিলেনের মত ভিলেনরা রয়েছেন।

ডঃ রায়ের কথা শুনে নিশ্চই আমার মুখের অবস্থা খুব করুণ হয়ে উঠেছিল। ডঃ রায় আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মনের অবস্থা এক মুহূর্তে বুঝে ফেলেছিলেন। তারপর বলে উঠেছিলেন, কি ব্যাপার জয়ন্ত! মনে হচ্ছে আমার কথা শুনে তুমি খুব ভয় পেয়ে গেছ?'

ভয় যে পেয়েছি সেকথা গোপন করে কোন লাভ নেই। বললাম, হ্যাঁ, স্যার। আপনার কথা শুনে সত্যিই ভীষণ ভয় করছে। যে লোকটা আপনাকে এরকম সাংঘাতিক চিঠি লিখতে পারে সে যে কী সাংঘাতিক লোক তা আন্দাজ করতে পারছি।

ডঃ রায় আমার পিঠে চাপড় মেরে বললেন, এইটুকু সামান্য ব্যাপারে ভয় পেয়ে গেলে বড় সাংবাদিক হবে কি করে? তারপর একটু হেসে বললেন, ঘাবড়ো না, ভয়ের কিছু না। যে বেটা এই চিঠি লিখেছে সে কিছু করতে পারবে না। অধিবেশনে আমি নির্বিঘ্নে বক্তৃতা দিয়ে আসব।

ডঃ রায়ের কাছ থেকে চিঠিখানা চেয়ে নিয়ে ভয়ে ভয়ে চোখ বুলোলাম ঃ

ডঃ রবি রায় সমীপেষু

আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছি যে আপনি মেক্সিকো সিটির বিজ্ঞান অধিবেশনে বক্তৃতা করতে আসছেন। একটা কথা আপনাকে পরিষ্কারভাবে জানাতে চাই তা হচ্ছে আপনার সাম্প্রতিকতম আবিষ্কারের ব্যাপারে আমরা যথেষ্ট খবর সংগ্রহ করেছি এবং ওই আবিষ্কার সম্পর্কে আমরা বিশেষভাবে আগ্রহী। এ সম্পর্কে আপনি আগেও আমাদের চিঠি পেয়েছেন; কিন্তু তার কোন জবাব আপনি দেন নি। তাই স্বাভাবিকভাবে আমরা ধরে নিচ্ছি যে আপনি আমাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে রাজী নন। ব্যাপারটা আমরা মোটেও ভাল চোখে দেখছি না এবং আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করার ফলও হাতেনাতেই পাবেন। মেক্সিকো সিটির অধিবেশনে আপনি বক্তৃতা দিতে পারবেন না।

শেষবারের মত আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি, এখনও ভেবে দেখুন। আপনার আবিষ্কার সম্পূর্ণ আমাদের হাতে তুলে দেবেন কিনা। টাকার অঙ্ক সম্পর্কে কোন আলোচনায় আগ্রহী থাকলে জানাবেন।

ইতি—এক্স

বক্স নম্বর 110, মেক্সিকো টাইমস।

এইরকম একখানা ভয়ঙ্কর চিঠি পেয়েও ডঃ রবি রায় এতটুকু ভয় পান নি, এটা লক্ষ্য করে আমি বেশ অবাক হলাম। আমিও এবার মনে একটু সাহস সঞ্চয় করার চেষ্টা করলাম।

চিঠিটা ডঃ রায়কে ফেরৎ দিয়ে বললাম, লোকটা কে হতে পারে তাকি আপনি বুঝতে পেরেছেন স্যার?

ডঃ রায় একটু রহস্যময় হাসি হেসে বললেন, এইসব মহাপুরুষদের কি চট করে চেনা যায়। এরা হচ্ছে বর্ণচোরা আম। তাছাড়া যে চিঠি দিয়েছে সে হয়তো ভাড়াটে গুণ্ডা। পিছন থেকে কে যে কলকাঠি নাড়ছে তা বলা বেশ মুস্কিলের ব্যাপার।

—তাহলে কি হবে স্যার?

কি আবার হবে? কোন গুণ্ডার হুমকি কি কোন সত্যিকারের বিজ্ঞানীকে তার কাজ থেকে সরিয়ে রাখতে পারে? আর তাছাড়া তুমি তো সঙ্গে থাকছ তাহলে আর ভয়টা কিসের? বলে আবার হাসলেন ডঃ রায়।

একথা শুনে আমি আরো ঘাবড়ে গেলাম; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিয়ে প্রশ্ন করলাম, এই লোকটা আগেও আপনাকে চিঠি দিয়েছিল?

—হ্যাঁ, সুপার-কনডাকটিভিটি নিয়ে যে গবেষণা আমি চালিয়ে যাচ্ছিলাম সেই ব্যাপারে এই লোকটা বা দলটা যথেষ্ট আগ্রহী।

সুপার কনটাকটিভিটির উপরেই তো আপনি অধিবেশনে বক্তৃতা দেবেন, তাই না স্যার?

হ্যাঁ।

—কিন্তু লোকগুলো সুপার কনডাকটিভিটি সংক্রান্ত গবেষণার সবকিছু কেনার জন্য টাকার লোভ অথবা প্রাণের ভয় দেখাচ্ছে কেন? প্রশ্ন করলাম আমি।

কারণ এর একটা বিরাট ব্যবসায়িক দিক রয়েছে। বললেন ডঃ রায়।

—সেতো আপনাকে রয়ালটি দিতেও করতে পারে।

—আসলে কি জানো জয়ন্ত, পৃথিবীতে কিছু মানুষের লোভ হয় আকাশ ছোঁয়া। টাকা ও সুনাম দুইই তারা পুরোপুরি হজম করতে চায়।

—আপনি ব্যাপারটা পুলিশে রিপোর্ট করেছেন কি?

ডঃ রায় একটু হেসে বলেছিলেন, পুলিশ এ ব্যাপারে এক্ষুনি আমাকে কোন সাহায্য করতে পারবে না। তবে সময়মত সব ওদের জানাতেই হবে।

মেক্সিকো সিটির আবহাওয়া প্রায় আমাদের দেশের মত। এখানে যখন দিন বারোটা তখন ভারতে রাত বারোটা। একপাশে প্রশান্ত মহাসাগর, অন্যদিকে গাল্ফ অব মেক্সিকো। সেটা পেরুলেই আটলান্টিক মহাসাগর। এই সেই ল্যাটিন আমেরিকা। কিছু দূরেই রয়েছে বিখ্যাত মায়া সভ্যতার প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ। এখন অনেক পণ্ডিতরা বলছেন যে এই দেশই ছিল নাকি আমাদের পৌরাণিক পাতাল।

যাহোক একটা চোদ্দতলা হোটেলে কনফারেন্সের বিজ্ঞানীদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ডঃ রবি রায়ের সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য স্থানীয় কাগজের এক সাংবাদিক যোগাযোগ করতেই ওকে জানিয়ে দিলাম যে উনি একা কোন সাংবাদিককে সাক্ষাৎকার দেন না। ভদ্রলোক একটু মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে ফোন ছেড়ে দিলেন।

ডঃ রায় আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন অধিবেশনের পর মায়া সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ দেখার জন্য চিচেনইৎজা, জীবিল

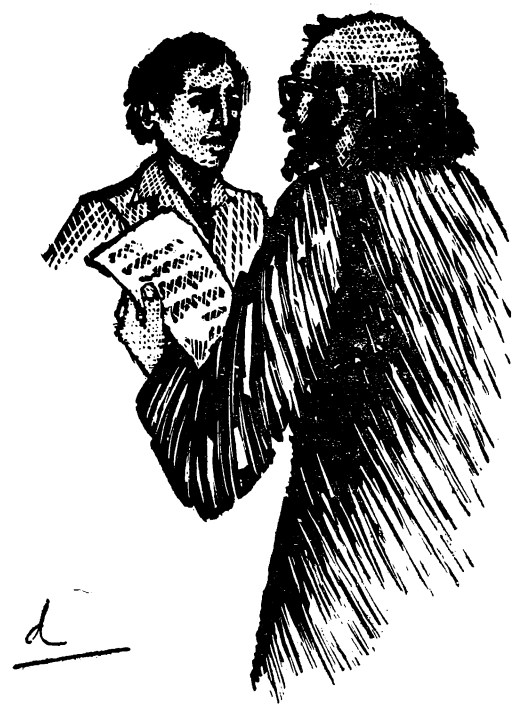

সামান্য ব্যাপারে ভয় পেলে বড় সাংবাদিক হবে কি করে

সুলতান প্রভৃতি জায়গা দেখিয়ে নিয়ে আসবেন। আমি তো দারুণ খুশি হলাম।

সেই মারাত্মক চিঠিটার কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। হঠাৎ সে রাতে বাইরে থেকে ঘুরে এসে হোটেলের ঘরে ঢুকে আমরা রীতিমত চমকে উঠলাম। সারা ঘর কেউ যেন ওলোটপালোট করে রেখেছে। দেখলেই বোঝা যায় কোন লোক বিশেষ কিছুর জন্য এরকমভাবে সবকিছু তছনছ করেছে।

আমি সঙ্গে সঙ্গে ফোনে ম্যানেজারকে আমাদের ঘরে আসতে বললাম। ভদ্রলোক সব দেখেশুনে রীতিমত ঘাবড়ে গিয়ে প্রায় ডঃ রবি রায়ের পায়ে ধরার উপক্রম। পুলিশে সব জানালে তার হোটেলের বদনাম হয়ে যাবে। দেশের বদনাম। যা ক্ষতি হয়েছে তা পূরণ করার প্রতিশ্রুতি দিতে লাগল ভদ্রলোক বারবার।

ডঃ রায় সব ভাল করে দেখে নিয়ে বললেন, আমার পেপারটাই ওরা চুরি করতে এসেছিল বলে মনে হচ্ছে। অন্য কিছুই টাচ করে নি।

শুনে তো আমি চমকে উঠলাম। মনে পড়ল সেই মারাত্মক চিঠির কথা। তাহলে ওরা আমাদের পিছু নিয়ে হোটেল পর্যন্ত ধাওয়া করেছে।

ম্যানেজার নিজে খোঁজখবর করে যেটুকু উদ্ধার করতে

পারল তাতে জানা গেল আমরা যখন বেরিয়ে গিয়েছিলাম সেই সময় একজন সাংবাদিক আমাদের খোঁজ করে। আমরা ঘরে নেই শুনে লবির সোফায় বসে অপেক্ষা করতে থাকে। তারপর আর রিসেপসনিস্ট লক্ষ্য রাখেনি।

গভীর রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাওয়ায় দেখলাম একজন লোক খুব দ্রুত হাতে আমাদের সব জিনিসপত্র তন্নতন্ন করে খুঁজছে।

কি চাও তোমরা? চিৎকার করে উঠলেন ডঃ রবি রায়। যে লোকটা জিনিসপত্র ঘাটছিল সে তার কাজ থামিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো ডঃ রায়ের দিকে।

—আমরা কি চাই তা তোমার অজানা নয় ডঃ রায়। ভালোয় ভালোয় বক্তৃতার কপিটি আমাদের হাতে তুলে দাও।

সে তো তোমরা দুপুরে এসে নিয়ে গেছ।

না, আমরা কোন কাগজপত্র খুঁজে পাইনি। তাই আসতে হল।

—তাহলে ভাল করে শোন। বক্তৃতার কোন টাইপ কপি তোমরা পাবে না। কারণ তা আমি তৈরী করিনি।

—তাহলে কি স্মৃতি থেকে বক্তৃতা দেবেন ডঃ রায়?

লোকটা ব্যঙ্গ করে উঠল।

ঠিক তাই। আমার স্মৃতিশক্তি খুব একটা খারাপ নয়। আর তাছাড়া এই প্লেটটা আছে, বলে বিছানার নিচে থেকে পোস্টকার্ড সাইজের একটি বিচিত্র প্লেট বের করলেন ডঃ রায়।

যে লোকটা দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সে আরো শক্ত হয়ে উঠল। অন্য লোকটি চিতাবাঘের মত লাফিয়ে এসে পড়ল ডঃ রায়ের ঘাড়ের উপর। উদ্দেশ্য ওই বিচিত্র প্লেটখানা কেড়ে নেওয়া। সঙ্গে সঙ্গে ডঃ রায় একটা অদ্ভুত কাজ করে বসলেন, প্লেটখানা জোরে ছুড়ে দিলেন ঘরের দেওয়ালে। প্লেটখানা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

আমি নিজের অজান্তেই বোধহয় চিৎকার করে উঠেছিলাম। লোকটা দ্রুত ফিরে ওর হাতের রিভলবারের বাঁট দিয়ে আমার মাথায় আঘাত করল। আমি বিছানা থেকে উল্টে পড়ে গেলাম মেঝের উপর। তারপর আর কিছু জানি না। জ্ঞান ফিরলে পর দেখলাম ডঃ রায় মাথার কাছে বসে আছেন। মনে গভীর উৎকণ্ঠা! সম্মেলন কি হয়ে গেছে? ডঃ রায় ইশারায় আশ্বস্ত করলেন—সম্মেলন হয় নি, বক্তৃতাও উনি ঠিকই দেবেন।

অধিবেশনের দিন মোটামুটি সুস্থ হয়ে উঠলাম। ডঃ রায়ের বক্তৃতা শুনতে গেলাম। ডঃ রায় সুপারকনডাকটিভিটির উপর এক দীর্ঘ ও বিশদ বক্তৃতা দিলেন। বিজ্ঞানীমহল হতভম্ব অধিবেশন কক্ষে সূঁচ পড়লেও বোধহয় তখন তার শব্দ শোনা যেত। বক্তৃতা শেষ হতেই হাত তালি আর অভিনন্দনের পালা শুরু হল। কিন্তু তার মধ্যেই ডঃ রায় মঞ্চ থেকে নেমে আমাকে নিয়ে খুব দ্রুত হোটেলে ফিরে এলেন। প্লেনের টিকিটেরও সব ব্যবস্থা উনি দেখলাম আগে থাকতেই করে রেখেছিলেন। হোটেল থেকে চটপট বেরিয়ে ট্যাক্সি নিয়ে সোজা এয়ারপোর্টে ছুটলাম আমরা।

আমি কিছু বলার আগেই ডঃ রায় বলে উঠলেন, এবার তোমাকে মায়াসভ্যতার ধ্বংসাবশেষ দেখাতে পারলাম না। এখন আমাদের পালাতে হচ্ছে। নাহলে হয়তো ভাগ্যে আছে বুলেট, বুঝেছ?

একথা না বোঝার মত বোকা আমি নই। প্রাণ বড় প্রিয় সেকথা কদিন আগে খুব ভাল করেই বুঝেছিলাম।

নির্বিঘ্নে প্লেনে উঠে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। ডঃ রায় বললেন, আপাততঃ নিশ্চিন্ত।

'স্যার একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?'

ডঃ রায় একটু হাসলেন। বললেন, আমি জানি তুমি কি জিজ্ঞাসা করবে। কি করে আমি অধিবেশনে বক্তৃতা শেষ করলাম, তাই না?

—হ্যাঁ স্যার। ব্যাপারটা আমার কাছে রীতিমত রহস্যময় বলে মনে হচ্ছে।—'রহস্যের বিশেষ কিছু নেই। হলোগ্রাফীর ব্যাপারটা জানো তো। বদমাইসদের ভয়ে বক্তৃতার টাইপ কপি তৈরী না করে আমি ওটার হলোগ্রাম তৈরী করেছিলাম। হলোগ্রাম প্লেট দেখে সাধারণ ভাবে কিছু বোঝা যাবে না। যে ধরনের লেসার বীম দিয়ে হলোগ্রাম তৈরী করা হয় ঠিক সেই লেসার বীম থাকে রেফারেন্স লাইট বলে, সেই রেফারেন্স লাইটের সাহায্যে হলোগাম প্লেট থেকে পুরো জিনিসটা রিপ্রোডিউস বা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব।

—কিন্তু প্লেটটা তো আপনি দেওয়ালে ছুড়ে ভেঙে ফেললেন?

—ওটা ইচ্ছে করেই করেছিলাম। তার কারণ হলোগ্রামের একটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য এই যে সামান্য একটা টুকরো থেকেও পুরো জিনিসটা পুনরুদ্ধার সম্ভব। প্লেটটা ভেঙে যাওয়াতে গুণ্ডাটা ওটা নেড়ে চেড়ে দেখে কিছু বুঝতে না পেরে ওগুলোয় লাথি মেরে তাড়াতাড়ি পালিয়ে যায়। এবার আমি নিশ্চিন্ত মনে মেক্সিকো বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় ওদের হলোগ্রাফ যন্ত্রে আমার বক্তৃতার পুরোটাই উদ্ধার করে নিলাম। তারপরের ব্যাপার তো তুমি জানই।

প্লেন এতক্ষণে মেঘের উপর উঠে পড়েছে। মায়া সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ এবার দেখা হল না বলে এখন আর খুব একটা দুঃখ হচ্ছেও না।

7/4 W2C, PH-11, গল্ফ গ্রিন, কলকাতা-45

চিকিৎসা বিজ্ঞানে কম্পিউটার

প্রমথেশ দাস

আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান অনেকাংশে কম্পিউটার নির্ভর। কম্পিউটারের দ্রুত বিশ্লেষণ করার ক্ষমতাকে চিকিৎসা-বিদ্যার বিভিন্ন পরীক্ষ-নিরীক্ষার কাজে লাগান হয়েছে। রোগীর রোগ নির্ণয়ের জন্য নানা প্যাথোলজিকাল টেস্ট করা হয়। এর একটা প্রথাগত পদ্ধতি আছে, যাকে বলে রুটিন টেস্ট। কম্পিউটার এই সব রুটিন মাফিক কাজ দ্রুত করে দেয় স্বয়ংক্রিয় ভাবে। তারপর বিশ্লেষণের ফলাফল দেখে ডাক্তারবাবু রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

হাসপাতালে বিভিন্ন রোগী যান। তাঁদের রোগের ইতিহাস, কি কি ওষুধ দেওয়া হয়েছিল, কিভাবে চিকিৎসা করা হয়েছিল—এসব হয় খাতায় লেখা থাকে, নয়তো ডাক্তার বাবুরা মনে রাখেন। এই সংরক্ষণের কাজ আজকাল করে কম্পিউটার। কম্পিউটারের স্মৃতিশক্তি অসীম, নির্ভুল এবং প্রখর। তাই প্রত্যেক রোগীর রোগের ইতিহাস ও বিস্তারিত বিবরণ কম্পিউটার সহজেই সংরক্ষণ করতে পারে। সে প্রত্যেক রোগীর নামে তৈরি করে নেয় আলাদা আলাদা ফাইল। এই সুষ্ঠু ব্যবস্থার ফলে চিকিৎসা সহজসাধ্য ও সুপরিকল্পিত হচ্ছে। একই রোগের উপসর্গ, কেস স্টাডি কম্পিউটারের স্মৃতিতে থাকলে ডাক্তারবাবুকে দ্রুত সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে তা সাহায্য করে।

ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট—যেখানে কোনও মানুষজনের বেশি ঢোকা বারণ সেখানে কম্পিউটার করে তত্ত্বাবধায়কের কাজ। সে রোগীর ই. সি. জি; ই. ই. জি প্রভৃতি মেপে রেকর্ড করে রাখে। এই যন্ত্রের নাম "কম্পিউটারাইজড্ মেডিক্যাল স্ট্যাটাস সিস্টেম।" রোগী ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে শুয়ে আছেন। তাঁর শরীরে কিছু প্রোব বা গ্রাহক যন্ত্র লাগান আছে। এতে রোগীর নাড়ির গতি দেহের তাপমাত্রা, রক্তচাপ, শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি ইত্যাদি তথ্য লেখার মাধ্যমে ফুটে ওঠে। কম্পিউটার ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণের রিপোর্ট এবং প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ ও সময়মত ডাক্তারবাবুর কাছে পাঠিয়ে দেয়। কম্পিউটারের স্মৃতিতে সুস্থ মানুষের ঐ সব শারীরিক তথ্য সঞ্চয় করা আছে। সুস্থ ও অসুস্থ মানুষের তথ্যগুলির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে সে ডাক্তারবাবুকে রোগীর অবস্থার কথা জানিয়ে দিতে পারে।

মনে করা যাক্ শহর থেকে দূরে কোন যায়গায় একজন ভদ্রলোকের হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। তাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা সম্ভব নয়। এর জন্য আমেরিকায় বেরিয়েছে 'পোর্টেবল সিস্টেম' যা দ্রুত রোগীর অবস্থা জানাতে পারে। এছাড়া এর সঙ্গে একটা ডি ফাইব্রিলেটর ও বৈদ্যুতিক শক্ ব্যবস্থা আছে যা সামান্য হার্ট অ্যাটাককে সারিয়ে রোগীর জীবন রক্ষা করবে। ডিফাই ব্রিলেটর এমন একটা যন্ত্র যা হার্টের কাছের মাংস পেশীকে শিথিল করতে পারে।

আজকাল কম্পিউটারের সাহায্যে ডায়াবিটিস, হৃদরোগ, মানসিক রোগ ও বহু দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসা করা সম্ভব। ডায়াবিটিশ রোগীর জন্যে আবিষ্কার হয়েছে ইনসুলিন পাম্প। নিউ মেক্সিকো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তাররা গত বছর একজন দুরারোগ্য ডায়বেটিক রোগীর শরীরে এই পাম্প স্থাপন করেছেন। এটি একটি ছোট পাম্প যা ব্যাটারীতে চলে। এই পাম্পের সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে ইনসুলিন পূর্ণ সিলিকোন রবারের একটি থলি। ব্লাড সুগার মাপক যন্ত্র রোগীর প্রয়োজন অনুযায়ী কম্পিউটারকে সংকেত পাঠায়। কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিক ঐ পাম্প দরকার মত ইনসুলিন রোগীর শরীরে পাঠায়। আধারের ইনসুলিন ফুরিয়ে গেলে ইন্জেকশনের মাধ্যমে তা পূরণ করা হয়।

ক্যান্সার রোগ নির্ণয়ে কম্পিউটার টোমোগ্রাফি বা ম্যাগনেটিক রেসোন্যান্স ইমেজিং যথেষ্ট সাহায্য করেছে। এক্স-রে ব্যবহার করে দেহের কোনংশের মিমাত্রিক ছবি পাওয়া যায়। কিন্তু ম্যাগনেটিক রেসোনান্স ইমেজিং এবং বিশেষ ধরনের কম্পিউটার প্রোগ্রামের সাহায্যে ভিসুয়াল ডিসপ্লে ইউনিট (V.D.U.) এবং পর্দায় ফুটে ওঠে রঙীন ত্রিমাত্রিক ছবি। তাই ত্রুটিপূর্ণ অঙ্গের কার্যকলাপ খুঁটিয়ে দেখতে হলে এই ব্যবস্থা অপরিহার্য। ক্যানসার চিকিৎসায় 'ইমিউনোমাই ক্রোস্ফিয়ার' নামে একটি কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রের আবিষ্কার হয়েছে। যন্ত্রটি প্লাসটিকের আস্তরণ দিয়ে ঘেরা একটি ছোট অথচ শক্তিশালী চুম্বক। তাকে পরিপূর্ণ-ভাবে ঘিরে থাকে এন্টিবডি। এই যন্ত্র চালায় একটি ক্ষুদ্র মাইক্রোপ্রসেসর। এই যন্ত্রের কাজ হল ক্যান্সার আক্রান্ত

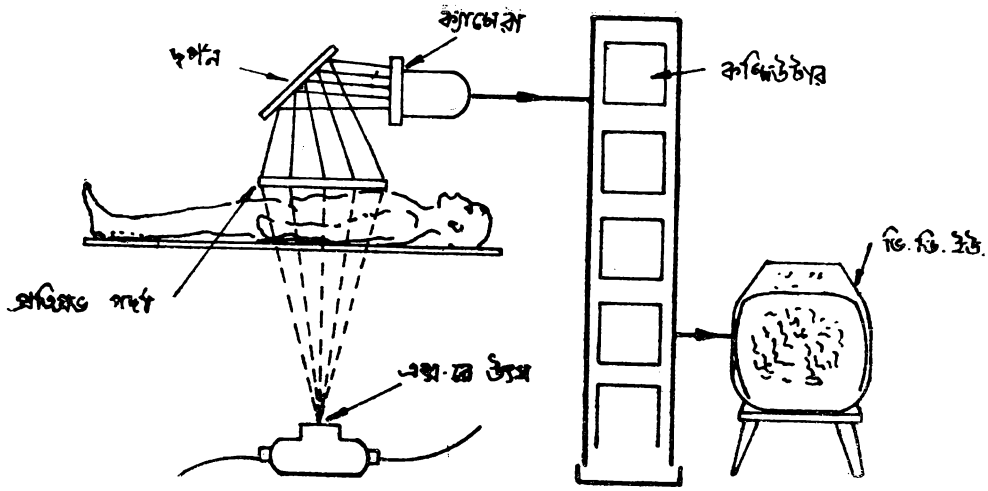

কোষগুলি সুস্থ কোষগুলির থেকে পৃথক করা ও রোগের সংক্রমণ রোধ করা।

হৃদযন্ত্রের জটিলতম সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশগুলি দেখতে সাহায্য করে পোর্টেবল গামা ক্যামেরা। একটি সিঙ্গল চিপ মাইক্রোপ্রসেসর দিয়ে ক্যামেরাটি নিয়ন্ত্রিত। এই ক্যামেরার কোথায় ব্লাডকট তা দেখে সহজে সঠিক অস্ত্রোপ্রচার করা যায়।

এ ছাড়া গ্রামের কোন রোগী কম্পিউটার নেট-ওয়ার্কের মাধ্যমে শহরের বিখ্যাত বিশেষজ্ঞকে দেখাতে পারে। দূর থেকে দেওয়া নির্দেশে শহরে ডাক্তারবাবু গ্রাম্য রোগীর চিকিৎসার ব্যাপারে উপযুক্ত পরামর্শ দিতে পারেন।

52সি, অধর চন্দ্র দাস লেন। কলিকাতা-70076

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিয়মাবলী

গ্রাহক ও এজেন্টদের প্রতি

- কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রতি ইংরাজী মাসের গোড়ার দিকে প্রকাশিত হয়।
- প্রতি সংখ্যার মূল্য 5·50 টাকা। বারো মাসের বৈশাখ-চৈত্র (April-March) গ্রাহক চাঁদা—হাতে 45·00, পোস্টে (Under Certificate of Posting) 50·00 টাকা। শারদ সংখ্যার মূল্য পৃথক।
- M O বা Bank Draft KISHORE JNAN BIJNAN-এর নামে পাঠাতে হবে।
- 25 কপির কমে এজেন্সী দেওয়া হয় না। কমিশন শতকরা 25 টাকা।
- ভি. পি. পি বা ব্যাঙ্ক মারফৎ পত্রিকা পাঠানো হয়। সংখ্যাপিছু গ্রাহকদের 1·00 টাকা করে সিকিউরিটি ডিপোজিট রাখতে হবে।

লেকদের প্রতি

- বিদ্যালয় পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রী এবং সর্বসাধারণের উপযোগী যে কোন বিজ্ঞানরচনা কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রকাশের জন্য পাঠানো যেতে পারে।
- পাতার একদিকে স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লেখা পাঠাতে হবে।
- সম্ভাব্য ক্ষেত্রে প্রতিটি রচনার সঙ্গেই ছবি পাঠাতে হবে।
- প্রেরিত রচনা সাধারণতঃ এক বছরের মধ্যে প্রকাশিত না হলে অনুমোদিত হয়নি বলে ধরে নিতে হবে।
- অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হয় না।

নিমের ভৈষজ্যতত্ত্ব

জীবনকৃষ্ণ সরকার

নিম গাছ হচ্ছে বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদ। নিমগাছের আকার বেশ বড় সড় হয় এবং এদের পাতা সারা বছর সবুজই থাকে তাই এদের চিরসবুজ উদ্ভিদ বলে। পথের দুধারে ঘরের আনাচে-কানাচে নিমগাছ সৌন্দর্য্য এবং ছায়া দুইই দান করে। গরমকালে নিমগাছের ছায়া খুবই আরামদায়ক। নিম আমাদের দেশে অতি প্রাচীনকাল হতে বহুগুণ সম্পন্ন ঔষধ হিসাবে পরিচিত হয়ে আসছে। নিমের কোন অংশই পরিত্যাজ্য নয়। তাই আমাদের দেশে নিমগাছের এত কদর। নিম গাছ বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন নামে পরিচিত। সংস্কৃতে নিমগাছকে বলা হয় নিম্ব বা রবিপ্রিয়। বাংলা, হিন্দি এবং পাঞ্জাবী ভাষায় একে নিম গাছই বলা হয়। গুজরাঠীতে বলা হয় লিম্ব; মারাঠী ভাষায় বলা হয়—কাদু নিম্ব, তেলেগু ভাষায় বলা হয়—ভেপা; মালয়ালম ভাষায় বলা হয়—ভেপপু এবং ইংরেজীতে এই উদ্ভিদের নাম মার্গোসিট্রি। নিমগাছ সম্পর্কে একটি পৌরাণিক কাহিনী চলিয়াছে—তাতে বলা হয়েছে দেবতারা নাকি স্বর্গে অমৃত নিয়ে যাচ্ছিলেন এবং সেই সময় কোন কারণে কয়েক ফোঁটা অমৃত ছলকিয়ে নিমগাছের উপর পড়েছিলো আর সেইজন্যই নাকি নিমের এতো গুণ। নিমের ফুল, ফল, পাতা, ছাল ও শিকড় এদেরকে বলা হয় পঞ্চ নিম্ব। প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্রে পঞ্চনিম্বের ব্যবহারের উল্লেখ আছে। প্রাচীন আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসাবিদ্ যেমন, চরক, সুশ্রুত, হারীত, চক্রদত্ত, বঙ্গসেন, এবং ভাবপ্রকাশ প্রত্যেকেই নিমের ভেষজগুণ বহুল ব্যবহারের উল্লেখ করেছেন।

নিমগাছ দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ। এদের পাতা যৌগিক, শিরাবিন্যাস-জালিকাকার, কিনারা করাতের মতো খাঁজকাটা। বসন্তকালে কচি কচি পাতা গজায়। এই ছোট ছোট সাদা ফুলের স্তবকে গাছ ভরে ওঠে। ফুলে মধুর মত এক প্রকার মিষ্টি গন্ধ থাকে। এর ফলে পরিবেশ মিষ্টি গন্ধে ম-ম করে। বর্ষার প্রথম দিকে ফল পাকতে শুরু করে, এবং হলুদ রঙ ধারণ করে। এই হলুদ পাকা ফলই পাখীদের অতি প্রিয় খাদ্য। নিমগাছের প্রত্যেকটা অংশই তিক্ত স্বাদবিশিষ্ট। প্রত্যেকটা ফলে একটি করে বীজ থাকে কখনো, কখনো দুটি বীজ থাকে।

নিমের বীজ থেকে এক প্রকার মূল্যবান তেল পাওয়া যায়, এই তেলের নাম মারগোসা তেল। ঔষধ হিসাবে নিমতেলের যথেষ্ট ব্যবহার আছে। নিম গাছের ছাল থেকে এক প্রকার গঁদের মত আঠা পাওয়া যায়। এই আঠা ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। বসন্তকালে ফলন্ত গাছের ছাল চিরে রাখলে সময় সময় খেজুর রসের মতো এক প্রকার রস পাওয়া যায়, এর নাম নিমের তাড়ি। এই তাড়িও ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। নিম গাছের কাঠ নানা প্রকার আসবাবপত্র, নৌকা তৈরী এবং গরুর গাড়ীর চাকা তৈরীর কাজে লাগে; কেননা এই গাছের কাঠ বেশ শক্ত। নিম গাছের বৈজ্ঞানিক নাম—অ্যাজাডিরাক্টা ইণ্ডিকা এরা মেলিয়েসী (Meliaceae) গোত্রের অন্তর্গত। এই গোত্রের আরো একটি গাছ মহানিম বা ঘোড়া নিম।

নিমপাতায় প্রতিটি খাদ্য উপাদান কি পরিমাণে আছে তা শতকরা হিসাবে নিম্নের সারনীতে উল্লেখ করা হলো।

খাদ্যউৎপাদন	নিমপাতা	কচি নিমপাতা
(1) প্রোটিন (Protein)	7·1 %	1·6 %
(2) স্নেহ (Fat)	1 %	3 %
(3) শর্করা (Carbohydate)	22·9 %	21·2%
(4) ধাতবলবন	3·4 %	2·6%
(5) তাপমূল্য (ক্যালরী)	129 ক্যালরী	158 ক্যালরী

খাদ্যের শক্তিমূল্য ক্যালরীর মাপে প্রকাশ করা হয়। উপরোক্ত সরণীতে আমরা দেখতে পাচ্ছি নিমপাতার চেয়ে কচি নিম পাতার ক্যালরী মূল্য (তাপ মূল্য) অনেক বেশী। প্রতি 100 গ্রাম নিমপাতায় আমরা 129 ক্যালরী তাপ মূল্য পেয়ে থাকি কিন্তু 100 গ্রাম কচি-নিম পাতায় আমরা 158 ক্যালরী তাপমূল্য পেয়ে থাকি। প্রোটিনের পরিমাণ কচি-নিম পাতার চেয়ে নিম পাতাতে বেশি পরিমাণে থাকে কিন্তু স্নেহ পদার্থের পরিমাণ নিম পাতার চাইতে কচি নিম পাতায় বেশি থাকে। শর্করার পরিমাণ নিম পাতা এবং কচি নিম পাতা উভয় পাতাতেই সমান পরিমাণে থাকে। এছাড়াও নিমপাতাতে ধাতব লবণ বেশ ভাল পরিমাণেই থাকে।

নিমের পাতা, ছাল, মূল, ফল, ফুল, ডাল, এবং কাঠও ঔষধের জন্য ব্যবহৃত হয়। নিমের হাওয়া বহুরোগনাশক বিশেষ করে, ম্যালেরিয়ায় অত্যন্ত উপকারী। নিমের

পাতা কৃমিনাশক ও কীটনাশক। এছাড়াও নিমের পাতা নানা প্রকারের ঘা, ফোঁড়া এমনকি অতি দূষিত ক্ষতেও বিশেষ উপযোগিতার সঙ্গে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ফোঁড়ার প্রথম অবস্থায় নিমের পাতা জলে বেটে প্রলেপ দিলে ফোঁড়া বসে যায়। বসবার অবস্থা না থাকলে, অর্থাৎ ফোঁড়ার মধ্য অবস্থায় নিমের পাতা মধুসহ বেটে প্রলেপ দিলে পেকে ফেটে যায়। ফাটবার পর গব্য ঘৃতসহ গরম করে প্রলেপ দিলে ক্ষত শুকিয়ে যায়। নিমের ডালের দাঁতনে বহু উপকার পাওয়া যায়। নিম ফলের তেল নানাবিধ চর্মরোগে, ক্ষতে এমনকি গলিত কুষ্ঠেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নিমছাল সিদ্ধ এবং ছালের চূর্ণ জ্বরের উৎকৃষ্ট ঔষধ। নিমপাতা ভাজা বা নিমের ঝোল বসন্ত রোগের প্রতিষেধক। যাঁদের পিত্তাধিক্য আছে তাঁরা কিছুদিন ধরে যদি প্রত্যেকদিন সকালে দুটো করে নিমের পাতা চিবিয়ে খান তাহলে যথেষ্ট উপকার পাবেন।

বিদ্যাসাগর পল্লী, ঝলঝলিয়া, মালদা, পিন—732102

বারকোড কি ?

সিদ্ধার্থ সরকার

শিরোনাম পড়েই অনেকে বলবে—বারকোড্! সেটা আবার কি? হ্যাঁ, খুবই স্বাভাবিক প্রশ্ন। বারকোড কি তা আমাদের অনেকেরই অজানা। এখন এর সম্পর্কে খুব সংক্ষেপে কিছু বলা যাক্।

আজকাল অনেক বিদেশী পত্রপত্রিকায়, বইয়ের পেছনের মলাটে, ফিল্মের বাক্সের গায়ে, সাবানের ব্যাপারে বা অন্য কোন পণ্যের প্যাকেটের বা বাক্সের গায়ে এককোণে এক-ধরণের একসারি সাদা ফাঁক এবং কালো, (অন্য কোন গাঢ় রঙের) সরু বা মোটা লাইনের সমষ্টিগত নক্শা দেখা যায়। লম্বালম্বিভাবে লাইনের এই সমাবেশকে "বারকোড" বলা হয়। এই বারকোড্ হল কম্পিউটারের মাধ্যমে বিশ্লেষণযোগ্য একধরণের নক্শা, যার সাহায্যে বিভাগীয় বিপণী সুপার মার্কেটে বিক্রীত সামগ্রীর হিসাব রাখা হয়। যার মাধ্যমে বিক্রীত দ্রব্যটির পরিচয় এবং উৎপাদকের পরিচয় জানা যায়। ক্রেতার কেনা জিনিষগুলো দোকান থেকে বেরোবার সময় কম্পিউটারের মাধ্যমে দ্রব্যটির বারকোড্ সংরক্ষিত হয়। ফলে অত্যন্ত সহজে এবং অত্যন্ত দ্রুত জানা যায় দোকানে কি কি বিক্রী হয়েছে। এর জন্য দোকানের মালিক বা সঞ্চালক (ম্যানেজার) জানতে পারেন তাঁর দোকানে কি কি সামগ্রী ফুরোল বা ফুরোতে চলেছে। সেই অনুযায়ী তাঁরা সময়মত নতুন সামগ্রী আমদানী করতে পারেন। এবার বারকোডের চেহারা সম্পর্কে কিছু জানাই।

লম্বালম্বি একসারি কালো বা অন্য কোন গাঢ় রঙের লাইনের মধ্যেকার সাদা ফাঁকের সমন্বয়ে তৈরী এই বারকোডে

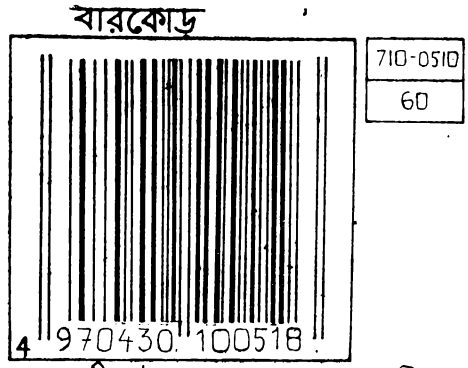

এক জাপানী পণ্যের বাক্সের গায়ে বারকোডের ছবি

0 থেকে 9 অঙ্কের মধ্যে সংখ্যা পরিবেশিত হয়ে থাকে বিভিন্নভাবে। লাইনগুলো এবং তার মধ্যবর্তী ফাঁকগুলো বিভিন্ন আকারের হয়। সংখ্যাগুলো পরিবেশিত হয় লাইনের নীচের দিকে। এই ধরণের নক্শার মাধ্যমে পরিবেশিত তথ্য কেবলমাত্র কম্পিউটারই ধরতে পারে।

পরিশেষে একটা কথা বলা ভালো যে, ভারতের বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কম্পিউটারের ব্যবহার ব্যাপক হলেও বারকোড পদ্ধতির প্রচলন এখনও হয়নি বললেই চলে। তবে বিজ্ঞানের এই অগ্রগতির যুগে হয়ত ভারতেও খুব শীঘ্রই এর প্রচলন হবে বলে আশা করা যায়।

210/এ/2, কালিচরণ ঘোষ রোড, সিঁথি, কলকাতা-50

আলেকজান্দর বেলায়েভের কাহিনী অবলম্বনে

উভচর মানব

বাণীরূপ : অনিল কর্মকার/চিত্রায়ণ : গৌতম কর্মকার

পর পর চার বার দরজায় টোকা মারলো বুড়ো। দরজা খুলে গেল···
নাতনিকে আমার জন্য-ভূতে ধরেছে। ডাক্তার-বাবুকে দেখাবো।
চত্বরে অজস্র রোগী এবং তাদের আত্মীয়-স্বজনের ভিড়··· নিগ্রো লোকটি ইঙ্গিতে বুড়োকে ভিতরের ঘরে পাঠিয়ে দিল।
সামনে স্বয়ং সালভাতর···
আজ অমাবস্যা। সামনের অমাবস্যার পর এখানে এসো। আশা করি তোমার নাতনিকে সুস্থ ফিরে পাবে।
আপনার অশেষ দয়া।
পক্ষকাল পর···
আমার একমাত্র নাতনির জীবন বাঁচিয়েছেন আপনি।
বিনিময়ে বাকিজীবনটা আপনার সেবা করতে দিন ডাক্তার।
কী নাম তোমার ?
ক্রিস্টোফার। ক্রিস্টো বলেই সবাই ডাকে।
ঠিক আছে, কাজ দেবো। কিন্তু বিশেষ কয়েকটি শর্ত আছে আমার।
বলুন ডাক্তার। সব শর্ত আমি নতমস্তকে পালন করে যাবো।
বেশ, তোমার নাতনিকে সহলে রেখে এসো। জিম তোমাকে কাজ বুঝিয়ে দেবে।
14

ফিরে আসার পর...
ইঙ্গিতে ক্রিস্টোকে ভিতরে নিয়ে গেল জিম।
কী ব্যাপার! কথা বলে না কেন?
বিরাট চত্বর এবং পরিচিত ঘরগুলি পার হয়ে আরও এগিয়ে গেল জিম।
কোথায় চলেছো? কথা বলছো না কেন?
বোবা নাকি?
সামনে এলো আর এক প্রস্থ দেয়াল। তেমনি ফটক। জিমের পিছনে এগিয়ে গেল ক্রিস্টো...
একি! হরিণ-মাথা বানর! কুকুর-মুখো সাপ! সিংহের শরীরে ষাঁড়ের মাথা! এ কোথায় এলাম?
আরও কিছু দূরে একটা বাড়ী। ইঙ্গিতে জিম দেখিয়ে দিল- এই তোমার থাকবার ঘর।
ওহ, এলাহি ব্যবস্থা! ভাগ্য ভালো বলতে হবে।
পরীক্ষাগারে কাজ করেন সালভাতর। বাইরের সব ফাই-ফরমাস খাটে ক্রিস্টো।
এক মাস হয়ে গেল। আর সন্দেহ আশা করি হবে না।

অবশেষে একদিন বিকেলে -যখন কাছাকাছি কেউ নেই…
এই দিকটায় নিষেধ আছে যাবার, কিন্তু কেন? আরও মূল্যবান কিছু নিশ্চয় আছে। খুঁজে দেখতে হবে।
বাহ -ঐ তো.. টিলার গায়ে একটা দরজা। ভিতরে কোনও ঘর কিংবা সুড়ঙ্গপথ নিশ্চয়ই আছে। দরজা মনে হচ্ছে বন্ধ। … আরে-দূরে যেন একটা কোলাহল ভেসে আসছে…
ঐ.. ঐ তো দেখ না … কী সুন্দর!
বে-লু-ন! ভেসে ভেসে যাচ্ছে। লাল-নীল রঙ। সময় হয়ে গেছে তাহলে।
নাতনির জন্যে মনটা বড় চঞ্চল হয়ে উঠেছে ডাক্তার। ছুটি চাই দু-চার দিন। আন্কিজ পাহাড়ে মেয়ের বাড়ী যাবো।
বেশ, যেয়ো। কিন্তু তাড়াতাড়ি ফিরবে।
এই নাও একথলি মোহর। তোমার নাতনির জন্যে। তবে সাবধান, এখানের কোনও কথা কিন্তু বাইরে বোলো না।
আজ্ঞে, কী যে বলেন! আমি কি এতোই অকৃতজ্ঞ?
এখনো তো লোকটার দেখা নেই হে? ধরা পড়ে যায়নি তো?
চিন্তার কথা। তবে, তা বোধহয় হবে না। ঐ-ঐ তো-কে যেন আসছে মনে হচ্ছে।
16

নতুন উদ্যোগ
নতুন শক্তি

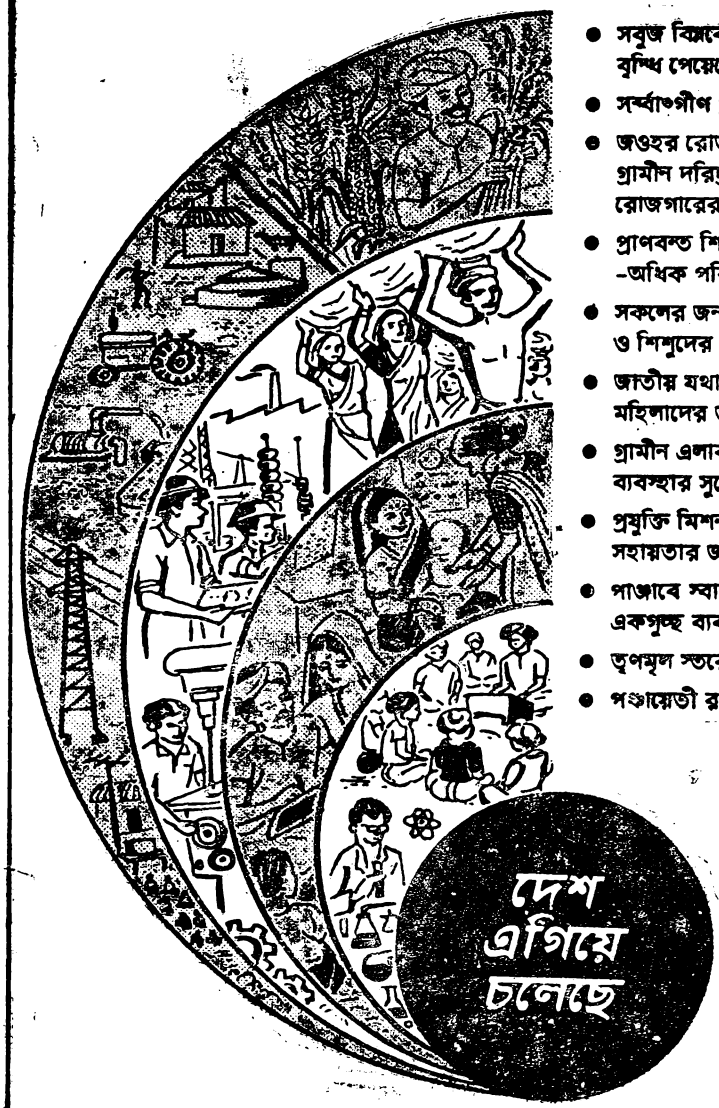

- সবুজ বিপ্লবের সম্প্রসারণে খাদ্য উৎপাদন তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে
- সর্ব্বাঙ্গীণ গ্রামীন উন্নয়ন
- জওহর রোজগার যোজনা; দরিদ্র সীমার নীচে থাকা গ্রামীন দরিদ্র পরিবারের অন্ততঃ একজনের জন্যে রোজগারের ব্যবস্থা।
- প্রাণবন্ত শিল্প; বাৎসরিক বৃদ্ধির হার ৯ শতাংশ -অধিক পরিমানে রপ্তানি।
- সকলের জন্য উন্নত স্বাস্থ্য সেবার ব্যবস্থা -মাতা ও শিশুদের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি।
- জাতীয় যথানুপাতিক পরিকল্পনার আওতায় মহিলাদের জন্যে নতুন ব্যবস্থাবলী।
- গ্রামীন এলাকার ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থার সুযোগ।
- প্রযুক্তি মিশন চালু - দরিদ্র জনগণের কার্যকরী সহায়তার জন্যে বিজ্ঞানের প্রয়োগ
- পাঞ্জাবে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে একগুচ্ছ ব্যবস্থাবলী।
- তৃণমূল স্তরে গণতন্ত্রের সম্প্রসারণ।
- পঞ্চায়েতী রাজের পুনরুজ্জীবন

স্বাধীনতা - সুস্থিতি -উন্নয়ন

davp 89/339 Ben.

নাবিকের নোঙ্গর

আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়

1493 সাল পৃথিবীর ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট বর্ষ। এই সালেই ক্রিস্টোফার কোলম্বাস ইউরোপের পশ্চিমে যে বিস্তীর্ণ ভু-ভাগ, তখনকার যুগে যা সাধারণ মানুষের চেতনার অগম্য ছিল, তার বাস্তব নিদর্শন. এক দল নতুন লাল মানুষ, প্রভূত পরিমাণে সোনা ও যাত্রাপথের সঠিক নিশানা নিয়ে স্পেনের রাজধানী বার্সিলোনায় ফিরে এলেন।

সমস্ত রাজামাত্য রাস্তায় নেমে এসে সম্ভ্রমে কোলম্বাসকে তুলে নিয়ে গেলেন রাজপ্রাসাদে। তাঁর স্থান হল রাজা ও রাণীর পাশে। পাঁচ হপ্তা ধরে বার্সিলোনায় বয়ে গেল উৎসবের বন্যা। ক্রোলম্বাসের ঐতিহাসিক আবিষ্কার স্পেনের রাজাকে এক সীমাহীন ভু-খণ্ডের একছত্র অধিপতি করে দিল। খ্রীস্ট ধর্ম বিস্তার ও ধনৈশ্বর্য আহরণের দিক দিশারী এই মহামান্য অভিযাত্রীকে সাধারণ নাবিক হিসাবে কখনোই গণ্য করা যায় না। কোলম্বাস তাই বিদেশী হলেও তাঁকে স্পেনের বিশিষ্ট ও মহামান্য নাগারক হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে রাজা ফার্দিনান্দ ফরমান জারি করলেন। তাঁকে বিশিষ্ট পদমর্যাদা দেওয়া হল। কোলম্বাস নিজের ও স্ব-বংশের প্রয়োজনে ব্যক্তিগত পতাকা, ব্যাজ ও ফেস্টুন ব্যবহার করতে পারবেন—লিখিতভাবে আদেশ হল।

রাজা ফার্ডিনান্দ রাজকীয় ফেস্টুনের রং অদল-বদল করে হুকুম দিলেন কোলম্বাস তাঁর ফেস্টুনের ওপর ডান দিকে রাখবে একটি স্বর্ণ-বর্ণ দুর্গের ছবি, বাঁ দিকে লেলিহ জিহ্বা সিংহ। দুর্গের নীচে থাকবে কতকগুলি বিক্ষিপ্ত সুবর্ণ দ্বীপ ও উদীয়মান একটি মহাদেশের ক্ষীণ ভাবমূর্তি। সিংহের ছাপের নীচে খালি অংশটিতে কোলম্বাসকে স্বাধীনতা দেওয়া হল তাঁর নিজের ইচ্ছামত যে কোনো উপযুক্ত নিজস্ব ব্যক্তিত্বের ছাপ সাজিয়ে নিতে পারবেন। কোলম্বাস সেখানে নীল পটভূমিতে পাঁচটি নোঙ্গর সমান্তরাল ভাবে এঁকে নিলেন।

বার্সিলোনা পর্ব শেষ হবার পর কোলম্বাস এই নোঙ্গর-লাঞ্ছিত নিশান ও ফেস্টুন নিয়ে উপর্যুপরি আরো তিনবার নতুন মহাদেশে পাড়ী দিয়েছিলেন। সেখানে যখনই তিনি ডাঙ্গায় পদার্পণ করতেন এবং রাজা ফার্ডিনান্দের নামে নতুন দেশের দখল নিতেন, তখনই ড্রামের বাদ্যি কিম্বা প্রার্থনার সুরের চেয়ে ফেস্টুন ও ব্যাজ জংলী রেড-ইণ্ডিয়ানদের নজর কেড়ে নিত!

অপরিচিত দেশ আবিষ্কারের পটভূমিতে, অজানা সৈকত রেখায়, সাগর, উপসাগরে কোলম্বাস মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন নোঙ্গরের একান্ত প্রয়োজনীয়তা। জাহাজ, জীবন ও জলধির সঙ্গে নোঙ্গরের যে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, নাবিক কোলম্বাস সেই প্রত্যয় রেখে গেছেন তাঁর নিজস্ব, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পতাকা ও ফেস্টুনে।

কোলম্বাসের কালে জাহাজ পরিচালন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যে রীতি নীতি বহাল ছিল, কালক্রমে সেখানে অনেক সূক্ষ্ম পরিবর্তন এসেছে ঠিকই, কিন্তু কোনো বৈপ্লবিক ওলট-পালট ঘটে নি। কোলম্বাস বুঝেছিলেন অজানা সমুদ্রে, সেখানের সমুদ্রতলের গভীরতা সম্বন্ধে কোনো জ্ঞানই নেই, যেখানে কোন সংরক্ষিত বন্দর বা স্থায়ী জাহাজ ঘাটার অভাব সেখানে একাধিক নোঙ্গরের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। অজানা উপকূল পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে পাথুরে তলদেশে কোলম্বাসের অনেকগুলি নোঙ্গর বসে গিয়েছিল। পর পর কয়েকটি তুফানে তাঁর সংরক্ষিত সমস্ত নোঙ্গর আটলান্টিকে বিসর্জিত হয়েছিল। এক কথায় নতুন মহাদেশ আবিষ্কার করতে গিয়ে এই স্বনামধন্য নাবিককে নোঙ্গরের অভাবে অবর্ণণীয় কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল।

ইংরাজী 'এ্যাঙ্কার' কথাটি এসেছে গ্রীক ভাষা থেকে। অর্থ আঁকড়া। সম্ভবতঃ প্রাচীনতম নোঙ্গর ছিল দড়ি বেঁধে ঝোলানো পাথরের চাঁই। প্রাচীন মিশরীয় মমির সমাধিতে যে জলযানের নমুনা পাওয়া গেছে তাতে এক জাতীয় পাথুরে নোঙ্গরের নমুনা মেলে। এই নোঙ্গর গুলির চেহারা অনেকটা ইংরাজী T অক্ষরের মত। নোঙ্গর ভারী করার প্রয়োজনে সেকালে পাথরের বদলে সীসাও ব্যবহৃত হত।

লোহা দিয়ে নোঙ্গর তৈরীর ধারণা গ্রীকদের মধ্যেই প্রথম প্রচলিত হয়। দু-দিকের সূচালো ফলা দিয়ে মাটি কামড়িয়ে রাখার পদ্ধতি প্লীনীর মতে গ্রীসের মানুষ থুস্‌কানের উদ্ভাবনা। প্রমাণ আছে 575 খ্রীস্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে প্রথম ফোর্জিং করা নোঙ্গর সৃষ্টি হয়েছিল। ফোর্জিং অর্থে গরম লোহাকে পিটিয়ে পিটিয়ে তার সহ্য ক্ষমতাকে অনেক গুণ বাড়ানো হল। গ্রীক উদ্ভাবিত নোঙ্গরের নক্সাই 1800 সাল পর্যন্ত ছিল নোঙ্গর বানানোর মূল ও বাঁধাধরা পথ।

1813 সালে প্রথম নোঙ্গরের ফলাগুলিকে ভিতর দিকে বেঁকিয়ে দিয়ে দেখা গেল তার কার্যকারীতা অনেক গুণ বেড়ে গেছে।

গ্রীক নমুনা থেকে বিবর্তিত হয়ে বাঁকানো ফলা ও কাঠের আড়াআড়ি একটি দণ্ডযুক্ত নোঙ্গর যখন সম্পূর্ণ লোহা দিয়ে বানানো হল তখন তার নাম হল 'এ্যাড্‌মিরালটি' নোঙ্গর। বৃটিশ নৌ কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনায় তৈরী এই নোঙ্গরের মাটি কামড়ে ধরার ক্ষমতা তখনকার দিনে ছিল সবচেয়ে বেশি জোরালো। 1852 সালে তাই বৃটিশ নৌ-বাহিনীর জাহাজে এগুলি রাখা অবশ্য কর্তব্য ধার্য হল। বর্তমানে এগলি আর বড় জাহাজে ব্যবহার হয় না। এগুলি ব্যবহারের মূল অসুবিধা, মাটি কামড়ে বসে গেলেও এর একটি ফলা সর্বদা মাটির ওপরে জেগে থাকবেই এবং এই ফলাতে নোঙ্গরের রশি বা চেন জড়িয়ে গিয়ে অনেক বিপত্তি ঘটিয়ে থাকে। এই বিপত্তি দূর করতেই ভাঁজ করা ফলা যুক্ত নোঙ্গরের পরিকল্পনা এল।

কম পক্ষে দুটি নোঙ্গর জাহাজে থাকবেই। এগুলি জাহাজের মাথায় দু দিকে ঝোলানো থাকে। নোঙ্গরের ঠিক নীচেই থাকে চেন লকার, যেখানে নোঙ্গর ঝোলাবার রশি বা চেন সাজিয়ে রাখা হয়। এই নোঙ্গর দুটিকে 'বাওয়ার' নোঙ্গর বলা হয়। তৃতীয় যদি কোনো নোঙ্গর জাহাজে থাকে তবে সেটি সাধারণতঃ হয় 'শীট' নোঙ্গর। অন্তিম বিপর্যয়ের সময়েই এটিকে স্মরণ করা হয়। জাহাজের পিছন দিক স্থির ভাবে এক জায়গায় ধরে রাখার জন্যে ব্যবহার হয় 'স্টীম' নোঙ্গর। বর্তমানে এগুলি কদাচ ব্যবহার হয়ে থাকে। 'কেজ' নোঙ্গর, যাকে 'গ্র্যাপনেল'-ও বলা হয়, বাংলা ভাষায় যা হয়েছে 'গেরাপী' সাধারণতঃ দেশীয় মাঝি-মাল্লাদের নৌকো-ডিঙ্গিতে দেখা যায়। এতে ছটা বা আটটা আঁকড়া থাকে। এগুলির সুবিধা হল ছোট নৌকায় করে বয়ে নিয়ে গিয়ে এগুলিকে প্রয়োজন মত জায়গায় স্থাপন করা চলে। যুদ্ধ জাহাজে এগুলির ব্যবহার হয় সাময়িক অবস্থানের প্রয়োজন হলে। উত্তাল সমুদ্রে ছোট ডিঙ্গি বা জীবন-তরীকে বাগে রাখার জন্যে 'সী' নোঙ্গর ব্যবহারের চল আছে। এই এই নোঙ্গরে লোহা-লক্কড়ের কোনো ভূমিকা নেই। এগুলি শক্ত ক্যাম্বিস ও দড়ি দিয়ে একটি ছোট ঝোলার আকারে তৈরী হয়। পৃথিবীর প্রতিটি জীবন-তরীতে একটি করে এই নোঙ্গর থাকবেই।

উনবিংশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত জাহাজের নোঙ্গর মোটেই নির্ভরযোগ্য ছিল না। তখনও লোহা জোড়া দেওয়ার ভাল মত কৌশল উদ্ভাবিত হয়নি। তাছাড়া তখনকার লোহার গুণমানও ছিল অনেক নীচু স্তরের। এই কারণ গুলির জন্যই অনেক সময়ে নোঙ্গরের ফলা জোড়নের জায়গা থেকে খুলে পড়ে যেত। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইংল্যাণ্ডের প্লাইমাউথের জাহাজ ঘাটায় পেরিং নামে এক সামান্য কেরানী

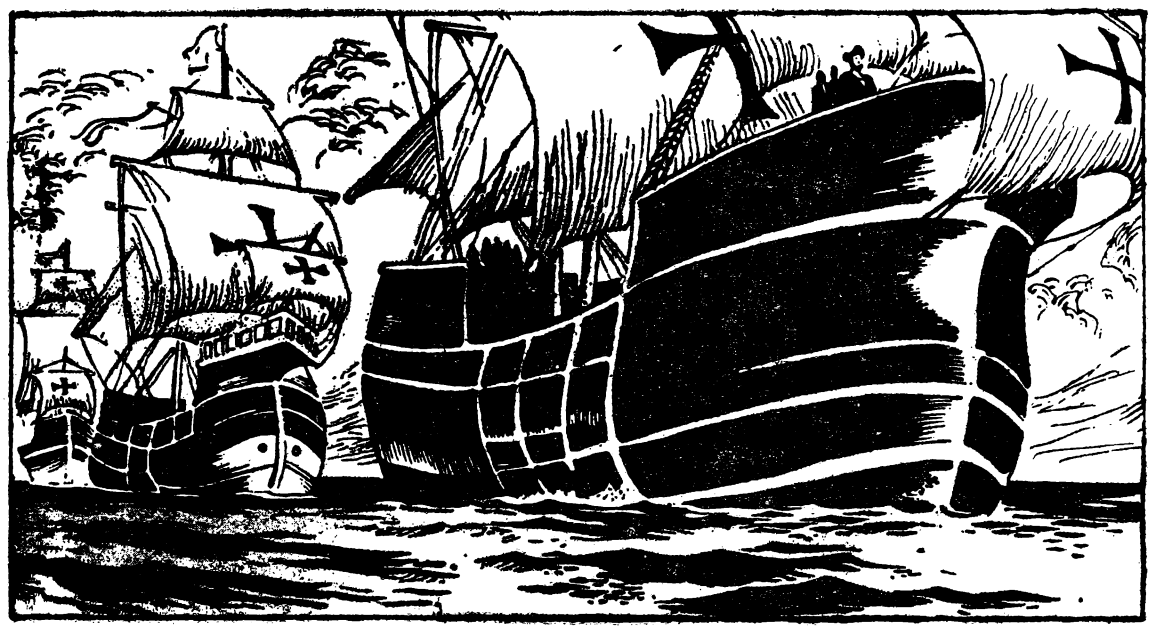

কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দেখালেন তখনকার দিনের নোঙ্গরের ক্ষণভঙ্গুর ও অপরিণত গঠন ভঙ্গী। তাঁর বিচক্ষণতা নোঙ্গরের মালমশলার যেমন পরিবর্তন ঘটাল, তেমনি অবয়বেরও উন্নতি হল। আর এক ফরাসী উদ্ভাবক মার্টিনের নামও এই সূত্রে উল্লেখ করতে হয়। 1852 সালে বৃটেনের নৌ-কর্তৃপক্ষ একটি কমিটির ওপর ভার দিলেন তৎকালীন প্রচলিত সব কটি নোঙ্গরের গুণমান পরীক্ষা করে একটি রিপোর্ট দাখিল করতে। কমিটির বিবেচনায় ট্রটম্যানের মডেলই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়েছিল।

জাহাজ নিরাপত্তায় এ কালের সংযোজন হল 'স্টকলেস' নোঙ্গরের (1821)। এগুলি ব্যবহার করা খুবই সহজ সাধ্য এবং প্রয়োজনে এগুলিকে জাহাজের গা থেকে ঝুলিয়ে রাখা সহজতর। 'এ্যাডমিরালটি' নোঙ্গরকে হটিয়ে দিয়ে এখন প্রতিটি বড় বড় জাহাজে 'স্টকলেস' নোঙ্গরই স্থান করে নিয়েছে। এ ছাড়া 'মাসরুম' 'প্লাউ' 'ড্যানফোর্থ' ও 'নর্থহিল' নোঙ্গরের নামও করতে হবে। এখনকার নোঙ্গরের ফলা দুইটিই থাকে মাটির ভিতরে, তাই নোঙ্গরের শিকল ফলায় জড়িয়ে যাবার ভয় থাকে না।

সঞ্চরণশীল জাহাজের জন্যই যে নোঙ্গরের একান্ত প্রয়োজন তা' নয়। নিশ্চল জাহাজ, যেমন আলোক বর্তিকা বাহিত জলযান, নদী বা সমুদ্রের চড়া চিহ্নিত করণের বয়া, কয়লার বাঙ্কার ইত্যাদির জন্যও বিশেষ বিশেষ ধরনের নোঙ্গরের প্রয়োজন হয়ে থাকে। বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই বিশাল বিশাল ফলাযুক্ত নোঙ্গর ত' হয়ই, তা' ছাড়া বিভিন্ন ঢংএরও নোঙ্গর তারই একটি উদাহরণ। এগুলি দেখতে উল্টানো ব্যাঙের ছাতার মত। বিরাট ওজনের জন্য এগুলি ক্রমশঃ মাটির ভিতরে বসে যায়। 'স্ক্রু' নোঙ্গরের পেঁচালো ফলা ঘুরে ঘুরে সমুদ্র তলে প্রবেশ করে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, যেমন তেমন একটি নোঙ্গর হলেই যে কোনো জাহাজের চলে না। জাহাজের টনেজ, তার দৈর্ঘ্য এবং কী, ধরনের কাজে জাহাজ লিপ্ত আছে বিবেচনা করেই জাহাজের নোঙ্গর নির্বাচন করতে হয়। এ ছাড়াও বিশেষ কোন দরিয়ায় সে জাহাজের গতায়াত, সেখানকার বাতাসের গতিবেগ ও আবহাওয়ার চরিত্র কী তা' মনে না রাখলে যেমন তেমন একটি নোঙ্গর নিলেই জাহাজ বাঁধা যাবে না।

বর্তমানে নোঙ্গর আর কাঁচা লোহায় তৈরী হয় না। ঢালাই ইস্পাত বা পেটানো ইস্পাত থেকে এখন নোঙ্গর বানানো হয়। নোঙ্গর কয়েক কিলো ওজন থেকে দশ টন বা আরো বেশী ওজনের হয়ে থাকে। সুপ্রসিদ্ধ জাহাজ টাইটানিকের মাথায় যে নোঙ্গর দুটি ছিল তার এক একটির ওজন ছিল পনেরো টন! নোঙ্গরটি জলে ফেলার শিকলের ওজন ছিল তিনশ' টন! বৃটেনের লয়েড সোসাইটি আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে বিভিন্ন জাহাজের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী কোন ধরনের নোঙ্গর রাখতে হবে, বাণিজ্য জাহাজের ক্ষেত্রে তার নির্দেশ দিয়ে থাকে। যুদ্ধের জাহাজে একাধিক বৈচিত্রময় নোঙ্গর রাখা থাকে, কারণ বিশিষ্ট অবস্থান ও বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনে এগুলির প্রয়োজন হয়। কোনো কোনো বন্দরে বা দরিয়ায় পুরো একটি নৌ-বাহিনী বা স্কোয়াড্রনকে নোঙ্গর ফেলে অবস্থান করতে হয়।

নৌ পরিচালনে নোঙ্গরের গুরুত্ব উপলব্ধি করেই মনে করা হয় নোঙ্গর নিশ্চিন্ততার প্রতীক। ইউরোপে মধ্যযুগের হস্ত শিল্পে, চারুকলা ও অলঙ্করণে নোঙ্গরের সদা সর্বদা ব্যবহার ছিল। এই প্রতীক নোঙ্গরের প্রচলন আবার সতেরোশো সালের শেষ দিকে শুরু হয়ে আঠারোশো সালের প্রথম দিক পর্যন্ত প্রভাবিত ইউরোপীয় 'বারোক' শিল্প কলায় ফুটে উঠেছে। তখনকার আংটি, অলঙ্কার ও মৃতের কবরের ওপর হামেশাই ক্রুশের আকারে নোঙ্গরের ছবি খোদাই করা হত মানুষের পুনর্জন্মের প্রতীক হিসাবে। মহামান্য পোপ প্রথম সেন্ট ক্লিমেন্টের সময়ে নোঙ্গর বন্দর কর্মী ও বাণিজ্য জাহাজের নাবিকদের জীবনে একটি অবশ্য স্মরণীয় স্মারক হিসাবে সন্ত ও সাধুদের মূর্তির পাশে স্থান পেয়েছিল। নোঙ্গর জীবনের প্রতীক হিসাবেই তখন সাধারণের কাছে অমূল্য হয়ে উঠেছিল।

18/1, সুকান্ত সরণী, কলিকাতা—700060

হরমোন বা উদ্বোধক সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্নোত্তর

ওমর আহমেদ

1. হরমোন কাহাকে বলে ?

উঃ। হরমোন হল একপ্রকার জৈব রাসায়নিক পদার্থ যাহা জীবদেহের বিশেষ ধরণের কতকগুলি কোষ থেকে উৎপত্তিলাভ করে বিশেষ উপায়ে বাহিত হয়ে দূরবর্তী কোন অঞ্চলের কোষগুলির কার্যকারিতাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং ক্রিয়ার পর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

2. হরমোন কে আবিষ্কার করেন ?

উঃ। হরমোন বিজ্ঞানী বেলিস ও স্টারলিং 1905 খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কার করেন।

3. হরমোন শব্দের অর্থ কি ?

উ ; 'হরমোন' শব্দের অর্থ হল, 'জাগ্রত করা'। হরমোন একটি গ্রীক শব্দ।

4. হরমোনের বৈশিষ্ট্যগুলি লিখ।

উঃ। হরমোনের বৈশিষ্ট্যগুলি হল ঃ—

(i) হরমোন একপ্রকার জটিল জৈব যৌগ ; ইহাদের রাসায়নিক চরিত্র বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে !

(ii) হরমোন নির্দিষ্ট কোষ বা গ্রন্থি হইতে ক্ষরিত হয়।

(iii) হরমোন সৃষ্টিস্থল হইতে দূরে কার্য করে (ব্যতিক্রম ঃ স্থানীয় হরমোন)।

(iv) হরমোন খুব স্বল্পমাত্রায় কার্যক্ষম হয়।

5. হরমোন কয় প্রকার ও কি কি ?

উঃ। হরমোন দুই প্রকার—(i) উদ্ভিজ্জ হরমোন বা ফাইটো হরমোন এবং (ii) প্রাণীজ হরমোন বা জু-হরমোন।

6. হরমোনকে রাসায়নিক দূত বলা হয় কেন ?

উঃ। 'হরমোন' একপ্রকার জৈব যৌগ, ইহা জীবদেহের কোষ বা গ্রন্থি হইতে ক্ষরিত হইয়া বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রবাহিত হয় এবং সেখানকার সমস্ত কার্যকে নিয়ন্ত্রণ করে। কার্য শেষে হরমোন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সৃষ্টি স্থল থেকে দূরে কার্য করিবার জন্য হরমোনকে রাসায়নিক দূত বলা হয়।

7. তিনটি কৃত্রিম হরমোনের নাম কর।

উঃ। তিনটি কৃত্রিম হয়মোন হল,2-4D ; MCPA (মিথাইল ক্লোরোফেনসি অ্যাসেটিক অ্যাসিড) এবং IAA (ইনডোল অ্যাসেটিক অ্যাসিড)।

8. তিনটি উদ্ভিজ্জ হরমোনের নাম কর।

উঃ। তিনটি উদ্ভিজ্জ হরমোনের নাম হল, (i) অক্সিন (ii) জিব্রালিন ও (iii) কাইনিন।

9. স্থানীয় হরমোন কাহাকে বলে ? উদাহরণ দাও।

উঃ। যে হরামান উৎপত্তিস্থলে ক্রিয়াশীল হয় তাকে স্থানীয় হরমোন বলে।

যেমন—গ্যাসট্রিন।

10. ফিরোমোন কি ?

উঃ। যোগাযোগ ও সংযোগকারী হরমোনকে ফিরোমোন বলে। ইহা পিঁপড়ের দেহে দেখা যায়।

11. উদ্ভিজ্জ হরোমোন কে আবিষ্কার করেন ?

উঃ। ফ্রান্সিস ডারউইন উদ্ভিজ্জ হরমোন আবিষ্কার করেন। ?

12. মানবদেহের সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম হরমোন গ্রন্থটির নাম কি

উঃ : মানবদেহের সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম হরমোন গ্রন্থটি হল, পিনিয়াল গ্রন্থি।

এরপর প্রশ্নোত্তর আগামী সংখ্যায়—

সৈদপুর, টাকী, ২৪ পরগনা (উঃ)

জীবনবিজ্ঞানের কয়েকটি টীকা-টিপ্পনী

সৌভিক আচার্য

1. রোটেশান (Rotation) : পাতা শেওলা, এলোডিয়া ইত্যাদি জলজ উদ্ভিদের কোষের প্রোটপ্লাজমের প্রধানতঃ যে একমুখী আবর্তন দেখা যায় তাকে রোটেশান বা প্রবাহ গতি বলে।

2. পেরিস্টলসিস (Peristalsis) : খাদ্যগ্রহনের পর ক্ষুদ্রান্ত্রে এক প্রচার আন্দোলন হয়, যে আন্দোলন খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে ও খাদ্যকে এগিয়ে নিয়ে যায়। একে পেরিস্টলসিস বা ক্রম-সংকোচন বলা হয়।

3. এণ্ডব্রাশ (End brush) : নিউরোনের অ্যাক্সনে (Axon) সাধারণত যে প্রান্তীয় শাখা দেখা যায়, তাকে এণ্ডব্রাশ বলে।

4. করপোরাকোয়াড্রিজেমিনা (Corporaquadrigemina) : মধ্য মস্তিষ্ক চারটি গোলাকার স্নায়ুস্ফীতি দ্বারা গঠিত। এই স্নায়ুস্ফীতি চতুষ্টয়কে করপোরাকোয়াড্রিজেমিনা বলা হয়।

5. অ্যাডেনোহাইপোফাইসিস (Adenohypophysis) : পিটুইটারী গ্রন্থির অগ্র খণ্ডাংশকে অ্যাডেনোহাইপোফাইসিস নামে অভিহিত করা হয়।

6. ফোরামেনম্যাগনাম (Foramenmagnum) : করোটির নিম্নে যে ছিদ্রপথে সুষুম্না কাণ্ড সুষুম্নামস্তিষ্কের সঙ্গে যুক্ত হয় তাকে ফোরামেনম্যাগনাম বলা হয়।

7. পিডোজেনেসিস (pidagenesis) : লার্ভার জনন পদ্ধতি।

8. পার্থেনোজেনেসিস (parthenagenesis) : নিষেক ছাড়াই জনন কোষে স্বাধীনভাবে হ্যাপ্লয়েড অপত্য সৃষ্টির পদ্ধতিকে পার্থেনোজেনেসিস বলা হয়।

9. ইশ্চেরিয়াকোলি (Ischeriacholle) : ইশ্চেরিয়া কোলি একটি মানুষের উপকারী ব্যাকটিরিয়া।

10. এন্টামিবাহিস্টোলাইটিকা (Entameobahistallitica) : এটি একটি আমাশয় রোগ সৃষ্টিকারী অপকারী আদ্যপ্রাণী (protazoa)।

11. রেনাল টিউবিউল (renaltubulc) : গ্লোমেরুলাসের (glomerulus) পরিস্রাব তরলের বাহকনালীকে রেনালটিবিউল বলা হয়।

12. সিস্টোল ও ডায়াস্টোল (Systalc & diastole) : হৃৎপিণ্ডের সংকোচনকে সিস্টোল ও প্রসারণকে ডায়াস্টোল বলে।

13. গ্যাসট্রোভ্যাসকুলার গহ্বর (Gastrovascular cavity) : ফাইলাম নিডারিয়া (phylum cnidaria) পর্বভুক্ত প্রায় সমস্ত সমুদ্রবাসী (ব্যতিক্রম, হাইড্রা)-দের দেহে একটি মাত্র নালী থাকে, নালীটিকে সিলেনটেরণ (coelenteron) বা গ্যাসট্রোভ্যাস্কুলার গহ্বর বলা হয়ে থাকে।

লালবাগ সিংঘী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, লালবাগ, মুর্শিদাবাদ।

জ্ঞান বিজ্ঞানের বই

কারিগরি ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রথম পাঠ

কলকাতার বিড়লা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়ামের বর্তমান অধিকর্তা শ্রী এস. কে. বাগচী একজন মাইনিং ইঞ্জিনীয়ার। তিনি ও তাঁর সহযোগীবৃন্দ, বিশেষ করে ডঃ পার্থ ঘোষ, শ্রীপার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসন্তোষ কুমার মিত্র দূরদর্শনে 'কোয়েস্ট' (Quest) নামে একটি বিজ্ঞান বিষয়ক প্রোগ্রামের সূচনা করে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা, বিশেষ করে পদার্থ ও রসায়ন বিজ্ঞানের মূল নীতিগুলির উপর ভিত্তি করে 'কোয়েস্ট' প্রোগ্রাম প্রবর্তিত হয়। শুধু ছাত্র-ছাত্রীরাই নয়, বিজ্ঞান-পিপাসু সকল শ্রেণীর মানুষের কাছেই 'কোয়েস্ট' ছিল এক অতি জনপ্রিয় টি. ভি. প্রোগ্রাম; গত চার বছর যাবৎ। এই গ্রন্থের (ইংরেজী লেখা) সব কটি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাই 'কোয়েস্ট' প্রোগ্রামে দেখানো ও ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। গ্রন্থে বর্ণিত সব কটি পরীক্ষাই টেলিভিশনে দেখানোর আগে লেখক ও তাঁর সহযোগীবৃন্দ নিজেরা হাতে কলমে করে সাফল্যলাভ করেছিলেন। টেলিভিশনে একবার দেখলেই তো তা মনে রাখা যায় না। তাই ছাত্র ও শিক্ষকদের কাছ থেকে লেখকের কাছে ক্রমাগত অনুরোধ আসতে থাকে—পরীক্ষা ও তার ব্যাখ্যা চিত্র সহযোগে ব্যাখ্যা করতে। লেখক সে অনুরোধ ফেলতে পারেন নি বলেই এই গ্রন্থটি জন্মলাভ করেছে। গ্রন্থটিতে প্রায় চৌষট্টিটি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা সুন্দর সুন্দর চিত্র সহযোগে বর্ণিত হয়েছে। প্রতিটি পরীক্ষার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও দেওয়া হয়েছে। ভারতের জল (water), পেনসিলের উপর কাগজকে ব্যালেন্স করা, সঙ্গীতরত চায়ের কেট্‌লি, শক্তির নিত্যতা সূত্র, নিউটনের প্রথম গতিসূত্র, পৃষ্ঠতল-টান, বারনৌলির নীতি, শৈত্যের দ্বারা জল ফোটানো, বরফের গলন, স্ট্র-অ্যাটো-মাইজার, রাসায়নিক আগ্নেয়গিরি ইত্যাদি পরীক্ষাগুলি খুবই চিত্তাকর্ষক। ছোট-বড় নির্বিশেষে সকল বিজ্ঞানপিপাসু মানুষেরই ভাল লাগবে, শুধু এই পরীক্ষা-গুলিই নয়, গ্রন্থে বর্ণিত সব পরীক্ষাই। তবে হ্যাঁ, সব কটি পরীক্ষা সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করা কিন্তু মোটেই সহজসাধ্য নয়। এরজন্য যথেষ্ট পরিশ্রম ও ধৈর্য্যের প্রয়োজন। ইংরেজীতে লেখা বলে বইখানি সর্বভারতীয় বাজারে সমাদৃত হবে। তবুও আমরা আশা করব যে এই গ্রন্থখানি বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন। গ্রন্থখানির ছাপা ও চিত্রাবলী সুন্দর।

শ্রীবাগচী ও প্রকাশককে ধন্যবাদ জানাই এমন একটি অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ প্রকাশের জন্য।

QUEST by Samar Bagchi
Indian Publising House, Calcutta-7, Rs. 20·00

—অমরনাথ রায়

জ্ঞান বিজ্ঞানের পত্রিকা

সম্প্রতি আমাদের দপ্তরে বেশ কয়েকটি পত্রিকা এসেছে সমালোচনার জন্য। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকার নাম 'নিউরবি'। বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী 'নিউটন' এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এর নাম সংযুক্ত করে 'নিউরবি' নামটি রাখা হয়েছে। পত্রিকার নামের সঙ্গে আদর্শের মিলও আছে। অর্থাৎ সাহিত্যরসে সমৃদ্ধ বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা এবং বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা ব্যতীত সাহিত্য হিসাবে ছোটদের উপযোগী কবিতা, উপন্যাস, গল্প ইত্যাদি পত্রিকাটিতে সন্নিবিষ্ট আছে। এ ছাড়াও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে বিশেষ কিছু রচনা, যেমন 'বাংলায় ভাল নম্বর পেতে হলে কি করা উচিৎ' 'ইংরেজীতে ভাল নম্বর করতে হলে' ইত্যাদি। আছে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী-দের জন্যে পদার্থ ও রসায়ন বিদ্যার সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী। 'শতবর্ষে ক্ষুদিরাম' শীর্ষক কবিতাটি অতীব সুন্দর। 'চিন্তা-মনি শিকড়' শীর্ষক ছোট্ট গল্পটি কিশোর-কিশোরীদের মন থেকে কুসং-স্কার দূর করতে সহায়ক হবে। 'প্রাচীন ভারতের চিকিৎসক ও চিকিৎসা বিদ্যা' শীর্ষক প্রবন্ধটি ছোট-বড় সকলেরই উপযোগী হয়েছে। একটা আদর্শ নিয়ে পত্রিকাটি প্রকাশিত হচ্ছে। সে আদর্শের সম্পূর্ণ প্রতিফলন দেখতে পাচ্ছি মার্চ—মে, 1989সংখ্যায়। লেখকবর্গও স্ব স্ব ক্ষেত্রে পণ্ডিত। কলেবরে ছোট হলেও বিষয় বৈচিত্র্যে পত্রিকাটি অনবদ্য। চিত্র, পত্রিকার সৌন্দর্য ও আকর্ষণ বৃদ্ধি করে। কিন্তু এই পত্রিকায় চিত্রের অভাব পত্রিকাটির আকর্ষণকে কিছুটা ক্ষুণ্ণ করেছে। সম্পাদক ও প্রকাশক কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। পত্রিকার দপ্তর 1, মনমোহন বসু স্ট্রীট, কলকাতা-6, প্রতি সংখ্যার মূল্য তিন টাকা। আমরা এই পত্রিকার বহুল প্রচার কামনা করি।

মডেলের রকমফের

নির্মলেন্দু বিকাশ পাত্র

ওয়াটার লেভেল ইণ্ডিকেটর

তোমরা নিশ্চয়ই ওয়াটার লেভেল কন্ট্রোলারের নাম শুনেছ, আজকাল বাজারে বিভিন্ন মডেলের এই কন্ট্রোলার পাওয়া যায়, তবে এসব গুলোর কোন কোনটা হয় ওয়াটার লেভেল ইণ্ডিকেটর না হয় কন্ট্রোলার, কিন্তু আমার মডেলটার বৈশিষ্ট্য হল, এতে উপরোক্ত দুটো সুবিধেই পাওয়া যাবে। অর্থাৎ একই সাথে এই মডেলের সাহায্যে তোমরা যেমন ট্যাঙ্কের মধ্যেকার জলের উচ্চতা জানতে পারবে তেমনি এই মডেলটাই ট্যাঙ্কের PUMP ON/OFF করে জলের তলও নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বজায় রাখবে।

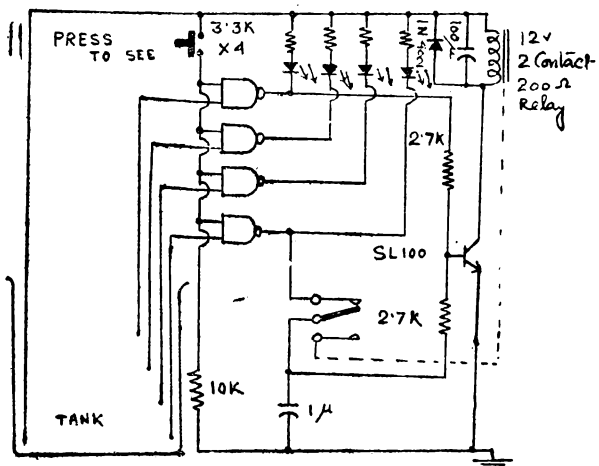

এবারে মডেলের অভ্যন্তরীন সার্কিটের কথায় আসা যাক। সার্কিটটা লক্ষ্য করে দেখ, ট্যাঙ্কের মধ্যে সুমানুসারে উচ্চতা অনুযায়ী চারটে পয়েন্ট ডোবানো আছে, আর একটা তার ট্যাঙ্কের গায়ে লাগানো আছে। যদি তোমাদের ট্যাঙ্কটা ধাতব হয় [অর্থাৎ Electricity Conductor দিয়ে তৈরি] তাহলে ঐ তারটা ট্যাঙ্কের গায়ে আটকে দিলেই চলবে। আর যদি ট্যাঙ্কটা অন্য কিছুর তৈরি হয় তবে ঐ তারটাকে ট্যাঙ্কের ভেতরে থেকে পর্যন্ত পৌঁছে দিতে হবে। আসলে ওটাই হল রেফারেন্স প্রোব। বাকী তারগুলোকে ছবির মতো উচ্চতা অনুযায়ী অর্থাৎ একটার কিছু ওপরে আরেকটা এইভাবে লাগাতে হবে। এই উচ্চতায় ব্যাপারটা ভুল করবে না কিন্তু। তোমাদের ট্যাঙ্কের জল নিরাপদে কতটা পর্যন্ত তোলা যেতে পারে সেই উচ্চতায় সর্বোচ্চ তারটা লাগাবে। আর জল ফুরিয়ে যে LEVEL-এ যাবার সাথে সাথে মোটর চালু হওয়া উচিত যেখানে রাখবে সর্বনিম্ন প্রোব, মাঝে রাখবে বাকী গুলো। সার্কিটে যে LED গুলো আছে সেগুলোর গায়ে ওর সংলগ্ন প্রোবগুলোর উচ্চতা লিখে রাখলে ক্রমান্বয়ে জ্বলে ওঠা LED এর সাহায্যে সহজেই জলের উচ্চতা তোমার বুঝতে পারবে। সার্কিটে আঁকা PRESS TO SEE সুইচটা টিপে তোমরা উচ্চতা দেখতে পারো।

এবার যদি তোমরা এই সার্কিটে ওয়াটার লেভেল 'কন্ট্রোলার' লাগাতে চাও তাহলে ওই সুইচটা Sort [জুড়ে] করে দাও। এরপর বাকী সার্কিক অর্থাৎ SL-100, Relay এবং অন্যান্য Component গুলো জুড়ে ফেল। সার্কিটের ভেতরে দেখ রিলের একটা Contact আঁকা আছে, ওটা দেখে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। আসলে ওটা এবং আরেকটা Contact সার্কিটের কাজে লাগবে। রিলের যে কন্ট্যাক্টটা আঁকা নেই সেটার N/O পয়েন্টের সাথে PUMP লাগাতে হবে, আসলে PUMP এর যে ON/OFF সুইচ থাকে সেটার দুটো পয়েন্টে যথাক্রমে N/O পয়েন্ট ও Com. পয়েন্ট লাগাতে হবে। সার্কিটের কাজ শেষ। এবার ঠিক মতো ক্যাবিনেট খোঁজার ভার তোমাদের। শেষে কয়েকটা প্রয়োজনীয় কথা বলে দিই, সার্কিট 12 VOLT এলিমিনেটারে চালাবে। যেহেতু রিলের কন্ট্যাক্টে 250 VOLT বিদুৎ দেওয়া আছে কাজেই সুইচ অন করার পর সার্কিটের কোন অংশে হাত দেবে না। এছাড়া CMOS IC এর জন্য প্রয়োর্জনীয় সাবধানতা অবলম্বন করবে।

গ্রাম+ডাকঘর—চামরাইল, জেলা—হাওড়া, 711323.

অক্টোপাস

দীপাঞ্জন ঘোষ

আমাদের পৃথিবীর স্থলভাগকে ঘিরে থাকা অসীম অনন্ত নীল সমুদ্রের তলদেশের জীবজগতেও স্থলভাগের ন্যায় নানা প্রাণী ও উদ্ভিদের এক বৈচিত্রময় সমবেশ ঘটেছে। সত্যিই সমুদ্রে কত না আশ্চর্য জীব অবাধে জীবন জাপন করে তার ইয়ত্তা নেই। স্থলভাগের মত এখানেও রয়েছে বিভিন্ন জলজ উদ্ভিদ, জলচর প্রাণী এবং বিচিত্র রকমের মাছ। অক্টোপাস এই রকমই এক জলচর প্রাণী।

অক্টোপাস [Octopus] মোলাস্কা [molluscs] পূর্বভুক্ত প্রাণী। ল্যাটিন 'মোলাস্কাস' শব্দটি থেকে 'মোলাস্কা' শব্দটি এসেছে; এর অর্থ 'নরম'। এরাএই মোলাস্কা পর্বভুক্ত সেফালোপডা [Cephalopoda] শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত প্রাণী। যাদের মাথা থেকে পা বা বাহু বের হয় [অক্টোপাসের ক্ষেত্রে আমরা যাকে শুঁড় বলি সেটাই পা বোঝায়] তাদের সেফালোপডা' বলা হয়। এখনও পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা অক্টোপাসের 100টি প্রজাতির কথা জানতে পেরেছেন। আর এই

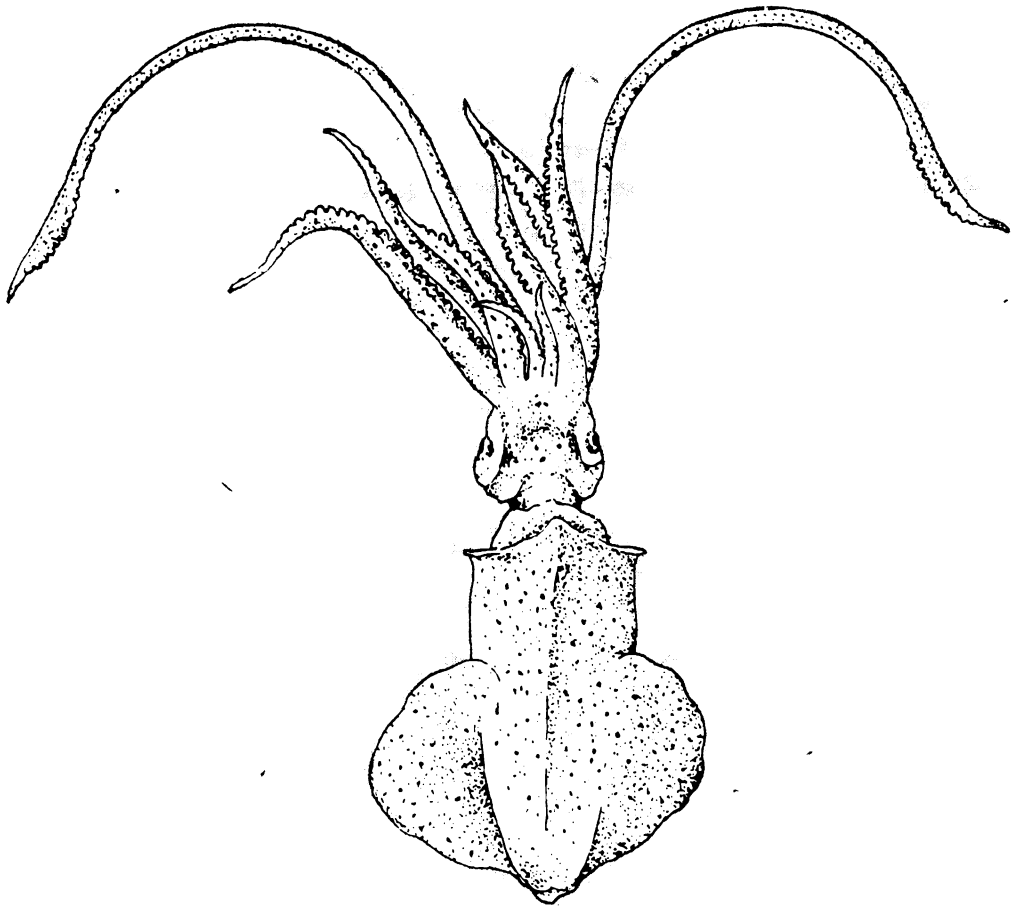

অষ্ট্রেলিয়ার বিষাক্ত অক্টোপাস

অক্টোপাস আকারে কয়েক ইঞ্চি থেকে 40 ফুট পর্যন্ত হতে পারে। সাধারণতঃ, আমরা যে অক্টোপাস দেখে থাকি তার বৈজ্ঞানিক নাম 'অক্টোপাস ভালগারিস' [Octopus vulgaris]।

অক্টোপাসের দেহে কোন হাড় গোড় নেই। গোটা দেহটাই থলথলে মাংস দিয়ে তৈরী মোলাস্কা পর্বভুক্ত অন্যান্য প্রাণীদের [যেমন শামুক, ঝিনুক ইত্যাদি] মত এদের দেহ কোন খোলস অর্থাৎ শক্ত আবরণে আবৃত থাকেনা। অক্টোপাসের মাথাটা নারকোলের মত হয়। মাথার ওপরের দিকে একজোড়া ফোলা-ফোলা চোখ থাকায় অক্টোপাসকে দেখে বেশ নিরীহ গোবেচারা গোছেরই মনে হয়। এদের মুখটি টিয়াপাখির ঠোঁটের মত ছুঁচোলো এবং বেশ ধারালো হয়। সাধারণতঃ শিকারের গা থেকে মাংস কুঁড়ে কুঁড়ে খাবার জন্য এই ধারালো ঠোঁটের প্রয়োজন হয়। এদের একটি ছোট জিহ্বা [radula] থাকে। অক্টোপাসের মুখের মধ্যে 'স্যালাইভারি গ্ল্যাণ্ড' নামক বিষভাঁত গ্রন্থি থাকে। এদের মাথা থেকে আটটি পা বা শুঁড় বের হয়েছে। এই শুঁড় গুলিকে টেনটাকুলস [tentacles] বলা হয়। এদের প্রতিটি শুঁড়ে দুটি সারিতে থরে-থরে একরকম গোলাকার জিনিস সাজানো থাকে। এগুলি অক্টোপাসের চোষক [Suckers]। কোন কোন অক্টোপাসের এক একটি শুড়ে অন্তত 300টি করে চোষক থাকে। তাহলে অক্টোপাসের আটটা শুড়ে থাকে 2400 চোষক। সত্যিই অবিশ্বাস্য ব্যাপার। বিজ্ঞানীদের মতে প্রাপ্তবয়স্ক অক্টোপাসের এক একটা বড় আকারের চোষক অনায়াসে 6/7 কিলোগ্রাম ওজন টেনে তুলতে পারে।

পৃথিবীর প্রায় সমস্ত সমুদ্রোপকুলেই অক্টোপাসের বাস। সমুদ্রের তলদেশে পাথরের খাঁজে বা গুহায় এরা আস্তানা গাড়ে।

অক্টোপাস মাংশাসী প্রাণী। সমুদ্রের শামুক, কাঁকড়া, গেঁড়ী, ঝিনুক, গলদা চিংড়ি ইত্যাদি অক্টোপাসের প্রধান খাদ্য। তবে এরা তিমির মাংস খুব পছন্দ করে।

অক্টোপাসের শিকার ধরার পদ্ধতির কথায় এবার আসি। শিকার ধরার ক্ষেত্রে অক্টোপাসের প্রধান অস্ত্র হল তার শুড় কাঁটা। কোন শিকার নাগালের মধ্যে গেলেই সে তার শুড় গুলি দিয়ে শিকারকে চেপে ধরে। এতেই শিকারের প্রাণ যায়-যায় অবস্থা হয়। তার পর অক্টোপাস শিকারকে কামড়াতে থাকে এবং এর ফলে স্যালইভারি গ্ল্যাণ্ডের বিষ শিকারের দেহে ঢুকে যায়। ফলে শিকার নিঃস্তেজ হয়ে পড়ে নয়তো মরে যায়। তারপর চোষক-গুলির সাহায্যে অক্টোপাস শিকারের রক্ত চুষে খায়। তবে বড় বড় শিকার, যেমন, তিমিমাছের ক্ষেত্রে অক্টোপাস শিকার-কে আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে না। শিকারের দেহ থেকে সে তার ধারালো ঠোঁটের সাহায্যে মাংস খুবলে খুবলে খায়।

কিন্তু একটা কথা ঠিক যে অক্টোপাস সবসময় শিকার ধরতে গিয়ে সফল হয় না। শক্তিশালী শিকারের সঙ্গে যুদ্ধে কখনও কখনও অক্টোপাসের দুই একটা শুড় ছিঁড়ে যায়। কখনও বা অক্টোপাস প্রাণ পর্যন্ত হারায়।

অক্টোপাসরা সাধারণত রাত্রে শিকার ধরে। তবে কয়েক প্রজাতির অক্টোপাস, যেমন, হাওয়াই দ্বীপের 'ডে অক্টোপাস [Day Octopus] দিনের বেলায় শিকার করে।

অক্টোপাসরা একটু লাজুক প্রকৃতির। তাই একা থাকতে ভালোবাসে। নিজের বাসস্থানের কাছে অন্য কোন প্রাণীকে এরা ঘেঁষতে দেয় না। তবে অক্টোপাস মানুষকে যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলে। এই জন্য গিরগিটির মতো অক্টোপাসকেও বহুরূপী হতে হয়েছে অর্থাৎ বিভিন্ন অবস্থান ও পরিস্থিতিতে এদের গায়ের রং পাল্টায়। যেমন ধর, ভয় পেলে অক্টোপাসের গায়ের রং হয় সাদা, কাউকে ভয় দেখানোর প্রয়োজন হলে তার গায়ের রং হয় লাল। এছাড়া বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এদের গায়ের রং কখনও সাদা-কালোয় ছিটে ছিটে, কখনও হালকা সবুজ, কখনও কখনও বাদামী, আবার কখনও বা লালচে বাদামী হয়। তবে অক্টোপাস যদি দেখে শত্রুর কাছে তার হার নিশ্চিত তাহলে সে দেহের একটি গ্রন্থি থেকে কালির মত একরকম পদার্থ নিঃসৃত করে আশপাশের জলে মিশিয়ে দিতে থাকে। এতে শত্রুর দৃষ্টি ও ঘ্রাণ শক্তি ব্যাহত হয়। তার জলের কালি পরিস্কার হতে যত সময় লাগে ততক্ষণে অক্টোপাস পগার পার। বিজ্ঞানী-দের মতে অক্টোপাস ভীষণ বুদ্ধিমান এবং দারুণ পরিশ্রমী।

অক্টোপাস সাধারণতঃ 5/6 বছর বাঁচে। একটা অক্টোপাস দুই সপ্তাহে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষের কিছু কম ডিম পাড়ে। এই ডিমগুলি খুবই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম হয়। ডিম ফুটে ছানা বেরোতে 5/6 সপ্তাহ সময় লাগে। স্ত্রী অক্টোপাস ডিমগুলির যত্ন আত্তি, বাসা তৈরী, শত্রু হাত থেকে রক্ষা করে। ডিম ফুটে বাচ্ছা বের হবার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী অক্টোপাসের মৃত্যু হয়।

অক্টোপাসের শেষ জীবনটা বড়ই দুঃখের। এরা যখন বুড়িয়ে যায় তখন শিকার ধরতে পারেনা, খেতে পায় না। এই রকম অবস্থায় অক্টোপাস শুঁড় কখানা তার টিয়া পাখির মতো ধারালো মুখে পুরে দেয় এবং মারা যায়।

ছোট নীল পুরী, পীরতলা পোঃ + জিলা—বর্ধমান-713103

কুইজ কনটেস্ট

গ্রেড I

গ্রেড-I সেপ্টেম্বর '89

1. কোন ব্যাকটিরিয়া দুগ্ধ শর্করাকে ল্যাকটিক অ্যাসিডে পরিণত করে ?

2 মানুষের দেহের একটি মিশ্র গ্রন্থির নাম কি ?

3. আনারসের চোখ জিনিসটা কি ?

4. কোন নীতির ফলে ডায়নামোতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় ?

5. রূপা ও প্লাটিনামের মধ্যে কার রোধাঙ্ক বেশি ?

6. কাগজ জৈব না অজৈব পদার্থ ?

7. 'মরক্কো লেদার' কিসের চামড়া ?

8. Slide Rule-এর আবিষ্কর্তার নাম কি ?

9. এমু পাখি কোন দেশে পাওয়া যায় ?

10. এ খেলার নাম কি কি ?

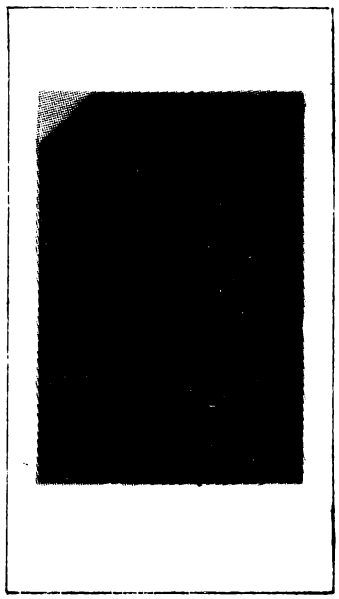

গ্রেড II

গ্রেড-II সেপ্টের '89

1. কোন ভারতীয় মহিলা প্রথম এভারেস্ট গিরিশৃঙ্গে আরোহন করেন ?

2. 'চিউইংগাম' প্রস্তুত করতে কোন gum ব্যবহৃত হয় ?

3. শ্বসনে সাধারণত কোন জৈব পদার্থ দাহ্য বস্তুরূপে কাজ করে ?

4. পৃথিবীর যাবতীয় জৈব পদার্থ সৃষ্টির মূল বিক্রিয়াটি কি ?

5. প্রাণিদেহে কোন কোষের বিভাজন হয় না ?

6. কোন বিজ্ঞানী বলেছিলেন যে তাপ এক প্রকার শক্তি ।

7. নীলগিরির দক্ষিণের গিরিপথটির নাম কি ?

8. 1990 খ্রীস্টাব্দে এশীয় ক্রীড়ানুষ্ঠান কোথায় অনুষ্ঠিত হবে ।

9. তারামাছের গমন অঙ্গের নাম কি ?

10. এঁকে চেন কি ?

গ্রেড III

গ্রেড-III সেপ্টেম্বর '89

1. জৈব বিবর্তন সম্পর্কিত মতবাদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যে বিজ্ঞান সম্মত পথ নির্ধারিত হয়েছে, তার নাম কি ?

2. স্কটল্যাণ্ডের সবচেয়ে বড় হ্রদটির নাম কি ?

3. কোন দেশের জাতীয় বিমান পথের নাম AVIACO ?

4. Almanac এবং Admiral শব্দদুটির উদ্ভব ঘটেছে কোন মূল ভাষা থেকে ?

5. 'ফিজিওলজিক্যাল স্যালাইন' কি জিনিস ?

6. যে অণুতে তিনটি কেলাস অণু আছে, রসায়নের ভাষায় তাকে কি বলে ?

7. হ্যালাইড আয়নদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী বিজারক কোনটি ?

8. নাইট্রোজেনের নিম্নতম জারণ সংখ্যা কত ?

9. ইনডেন কুকিং গ্যাসে কি কি উপাদান, কেমন অবস্থায় থাকে ?

10. এটি কিসের ফটো ?

শব্দকূট

বিকাশচন্দ্র মণ্ডল

পাশাপাশি

1. এককোষী প্রাণী, 3. মাছের বাচ্চা, 4. সামুদ্রিক কীট থেকে তৈরী রত্নবিশেষ, 6. ফ্লোয়েম উদ্ভিদের একটি— 9. মেকং নদীর অববাহিকায় উল্লেখযোগ্য সমভূমি, 12. প্রাণীর অস্থিপঞ্জর, 14. আনন্দ — নামে একটি সংস্থা, 15. দুই তৈল উৎপাদক অঞ্চলের মধ্যে বহুদিন যাবৎ যুদ্ধে লিপ্ত ছিল, তার একটি দেশ।

উপর-নিচ

1. একটি মহাকাশযান ও গ্রীসের প্রাচীন সূর্যের দেবতার নাম, 2. ধাতুর কাঁচের মত মসৃন পদার্থের কলাই, 5. ব্যাঙের মলাশয়ের পর সরু অংশ, 8. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 507 মাইল দৈর্ঘ্যের এক উল্লেখযোগ্য খাল, 10. তৈল উৎপাদক দেশগুলির এক সম্মিলিত সংস্থা যা তৈল আন্তর্জাতিক বাজার দর নির্ধারণ করে, 11. টাকা, 13. এক নিষ্ক্রিয় মৌলিক পদার্থ যার পারমাণবিক সংখ্যা 18, 14. এখন বেঁচে নেই সে '—' গেছে।

হাসিমনগর (রথতলা), ভায়া—ফতেপুর, দক্ষিণ 24 পরগণা 743513

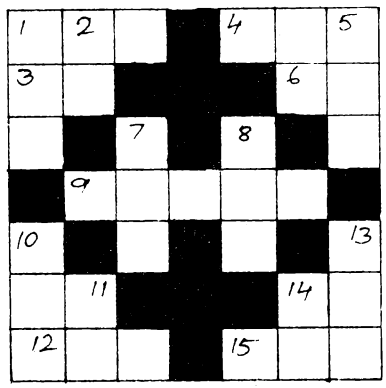

আইকিউ টেস্ট সেপ্টেম্বর '89

1. পরবর্তী সংখ্যাটি কত হবে—
   8 10 14 22 ?
2. নিচের রাশিগুলির মধ্যে কোনটি ভেক্টর নয়—
   (a) সরণ, (b) বল, (c) কৌণিক ভরবেগ, (d) চাপ।
3. ভাইরাস জীবকোষের বাইরে সংখ্যায় বাড়ে না—
   (a) হ্যাঁ, (b) না।
4. নিচের কোন মৌলটি ছাড়া অপর মৌলগুলি অপেক্ষা অক্সিজেন বেশি তড়িৎ ঋণাত্মক—
   (a) ক্লোরিন, (b) নাইট্রোজেন, (c) সালফার।
5. তিনটি ক্রমিক সংখ্যার সমষ্টি 129 সংখ্যাগুলি কি কি ?

ক্যুইজ কনটেস্ট সমাধান

জুলাই '89 VII-VIII গ্রেড-I

1. 1954 খ্রীষ্টাব্দে। 2. ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ। 3. 2062 সালে। 4. বলবীর সিং। 5. Mallet. 6. চার্মকাইট। 7. ফরাসী। 8. সামুদ্রিক কচ্ছপ। 6. কুতুবুদ্দিন আইবক। 10. তামিলনাড়ু।

জুলাই '89 IX-X গ্রেড-II

1. কৃষ্ণকায় লোমশ তিব্বতীয় ষাঁড়। 2. কর্নাটকের ব্রহ্মগিরি পর্বত থেকে। 3. 70। 4. বিজ্ঞানী জি.টি. সীবর্গ। 5. শুটিং। 6. বল্লাল সেন। 7. পরমাণু ক্রমাঙ্কের উপর। 8. ভিটামিন C। 9. গোল্ডকোস্ট। 10. লাহোরের তালবন্দী গ্রামে।

জুলাই '89 XI-XII গ্রেড-III

1. ইঁদুর। 2. বাচেন্দ্রি পাল। 3. মিথাইল আইসো সায়ানেট সংক্ষেপে মিক। 4. পাকিস্তানী ক্রিকেট-দলের প্রাক্তন অধিনায়ক জাহির আব্বাস। 5. সরোদ। 6. ওকাপি। 7. W.B yeats. 8. Chikle. 9. চাঁদ। 10. শীতল জলবায়ু।

আইকিউ টেস্ট সমাধান

আই-কিউ-টেস্ট / জুলাই 1989-এর সমাধান

1. 35=[49−(2×7)] 2. কুরী বিন্দু (Cure point) 3. (b) কঠিন NaCl 4. (b) যৌগিক পত্র থেকে 5. লর্ড রিপন 'হাণ্টার কমিশন' নিয়োগ করেন।

শব্দকূট সমাধান

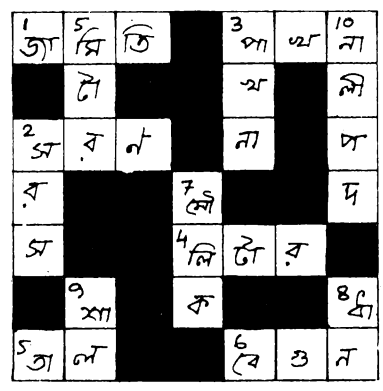

বলতে পারো কেন ?

সুধাংশু পাত্র

গত মাসের প্রশ্ন

"মানুষ ঘুমানোর সময় স্বপ্ন দেখে কেন ?"

উঃ স্বপ্ন দেখর অনেক কারণ আছে। মনোবিজ্ঞানীরা যে কারণটির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন—তা হল স্বপ্ন অবচেতন মনের ফসল। অর্থাৎ তাঁদের মতে মানুষ প্রতিদিন নানা ধরনের চিন্তা ভাবনা ও কাজকর্ম করে থাকে। মাঝে মাঝে এমন সব কল্পনা করে, যা বাস্তবে সফলও হয় না। যেহেতু মনোবিজ্ঞানীরা মনকে 'চেতন' ও 'অবচেতন' দুভাগে ভাগ করেছেন এবং মানুষের যেসব কল্পনা পরিপূর্ণতা লাভে ব্যর্থ হয় সেগুলি অবচেতন মনে স্থান পায়। ঘুমানো তথা পূর্ণ বিশ্রামের সময় মন সেগুলো পর্যালোচনা করে এবং বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে বলে মনে হয়। গাঢ় ঘুমের সময় মানুষ কিন্তু স্বপ্ন দেখে না। ভোরের দিকে ঘুম পাতলা হয়ে উঠলে নানা ধরনের স্বপ্ন দেখে।

এ মাসের প্রশ্ন

"রেল লাইনের মাঝে মাঝে ফাঁক রাখা হয় কিন্তু ট্রাম লাইনে ফাঁক রাখা হয় না কেন ?"

জানতে চেয়েছে দেবাশিস গায়েন, রেফাইৎপুর চন্দ্রহাটি হুগলী থেকে। (1) অচিমনি সাহু পারুলিয়া—জামুয়া শঙ্করপুর মেদিনীপুর থেকে জানতে চেয়েছেন দুধ গরম করলে উথলায় কেন ; (2) যমজ সন্তান কেমন করে জন্মায়, এবং মৌমাছি কেমন করে মধু সংগ্রহ করে এবং মানুষের দুটি চোখ থাকার সুবিধা কী জানতে চেয়েছে অসীম বিশ্বাস, বগুলা কলেজপাড়া নদীয়া থেকে। তোমাদের প্রশ্ন মাত্র কয়েকটি সংখ্যার বাবধানে দেওয়া হয়েছে। কষ্ট করে একটু দেখে নাও।

প্রঃ কোন্ সামুদ্রিক প্রাণী মানুষের মত কথা বলতে পারে। আশিস, গৌতম, রনজিৎ, সুকান্ত-আমকোলা-গাইঘাটা উঃ 24 পরগণা।

উঃ কোন সামুদ্রিক প্রাণী এমনকি মানুষ ছাড়া কোন ডাঙার প্রাণীও কথা বলতে পারে না। তবে সামুদ্রিক ডলফিনরা মুখে শিষ দেওয়ার মত এক ধরনের শব্দ করে। সেটি তাদেরই কাছে বিশেষ অর্থবহ। এও সত্য যে, কেবল ডলফিন নয়-ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকা মাকড় থেকে উন্নত মেরুদণ্ডী জীবরা পর্যন্ত সবাই নিজের মধ্যে সঙ্কেত সূচক শব্দ আদান প্রদান করে থাকে।

প্রঃ নক্ষত্রদেহে আলো কেমন করে উৎপন্ন হয় ? পার্থ সারথী বেরা, মেটেরা, তারকেশ্বর হুগলী।

উঃ নক্ষত্রদেহে বিশাল হাইড্রোজেন ভাণ্ডার পারমাণবিক বিক্রিয়ায় শেষ অবধি হিলিয়ামে রূপান্তরিত হচ্ছে। আমাদের সূর্যের মত এক একটি মাঝারি ধরনের নক্ষত্রে প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় 56 কোটি টন হাইড্রোজেন হিলিয়ামে পরিণত হয়। উক্ত পারমাণবিক বিক্রিরাই নক্ষত্রপৃষ্ঠে প্রচণ্ড তাপের উৎস।

প্রঃ কীট পতঙ্গরা কেমন করে আবহাওয়ার পূর্বাভাস পেয়ে থাকে ? শঙ্কর কুমার চক্রবর্তী, 7/8 নিউল্যাণ্ড সিক্স. এফ. কিষ্ট. । পোষ্ট-বাটানগর, দঃ 24 পরগণা।

উঃ এটি আজও মানুষের কাছে একটা বড় বিস্ময় এবং গবেষণার বিষয়। বহুজনে এই বিষয় নিয়ে গবেষণা করছেন। তোমরাও ঐ পিঁপড়ে ইত্যাদিকে নিয়ে গবেষণা করনা ! পরে বড় হলে কীটপতঙ্গদের আশ্চর্য ক্ষমতাগুলি নিয়ে উচ্চতর গবেষণায় ব্রতী হবে ?

প্রঃ হেটারোসাইক্লিক যৌগ এবং আইসোমার কাকে বলে। মহম্মদ আলাউদ্দিন। মোরগ্রাম, বর্ধমান।

উঃ হেটারোসাইক্লিক যৌগকে বাংলায় বলা হয় অসম সংবৃত্তাকার যৌগ। যে সব জৈব যৌগে কারবন পরমাণুগুলো সংবৃত্ত রিঙের আকারে পরস্পর আবদ্ধ অবস্থায় সংযুক্ত থাকে তাদেরই বলা সংবৃত্তাকার যৌগ। এদের দুটি শাখা সম সংবৃত্তাকার ও অসম সংবৃত্তাকার। সম সংবৃত্তাকার যৌগের দুটি উপশাখা (1) অ্যারোমেটিক যৌগ ও (2) অ্যালি সাইক্লিক যৌগ। এদের রিং একমাত্র কারবন পরমাণুর সংযোগে গঠিত। যেমন বেনজিন (C_6H_6) ও সাইক্লো-হেক্সেন (C_6H_{12})

অপরপক্ষে যে সংবৃত্ত জৈব যৌগের রিং বা বলয় কারবন পরমাণু ছাড়াও এক বা একাধিক অন্য মৌলের পরমাণুর সংযোগে গঠিত, তাদেরই বলা হয় অসম সংবৃত্তাকার যৌগ।

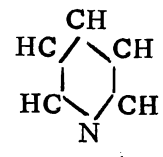

যেমন পিরিডিন (C_5H_5N) আইসোমারকে বাংলায় সমাংশ

যৌগ বা সম সঙ্কেতক বলা হয়। কারণ, আইসো অর্থে সম এবং মোরাস অর্থে অংশ।

কেবলমাত্র আণবিক সঙ্কেত দিয়ে জৈব যৌগের স্বরূপ নির্ধারণ করা যায় না। কারণ, C_2H_6O সঙ্কেত দুটি জৈব যৌগের-ইথাইল অ্যালকোহল (C_2H_5OH) এবং ডাই মিথাইল ঈথারের ($CH_3—O\ CH_3$)। তেমনই $C_6H_{12}O_4$ সঙ্কেতের দ্বারা 66টি, C_9H_2O দ্বারা পঁয়ত্রিশটি C_5H_{12} দ্বারা তিনটি ; CN_2H_4O দিয়ে দুটি (NH_4CNO এবং $CO(NH_2)_2$] জৈব যৌগকে প্রকাশ করা যায়। তাই জৈব যৌগের ক্ষেত্রে একই আনবিক সঙ্কেত অনুযায়ী বিভিন্ন ধর্মের একাধিক যৌগ গঠনের রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ঐ বৈশিষ্ট্যকে বলা হয় সমাংশ ধর্ম বা আইসোমারিজম এবং একটি সঙ্কেতে গঠিত বিভিন্ন ধর্মবিশিষ্ট যৌগগুলোকে বলা হয় সমাংশ বা আইসোমার।

প্রঃ পরিবাহীর অতি পরিবাহিতা কি? এর আবিষ্কর্তা কে এবং কীভাবে আবিষ্কৃত হয়েছে। অতি পরিবাহিতায় পরিবাহীর রোধ কী একেবারে শূন্য হয়ে যায়? কার্তিক দত্ত, চণ্ডীপুর, তারাপীঠ বীরভূম।

উঃ যেসব পদার্থের ভেতর দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ সহজে চলাচল করতে পারে তাদের বলা হয় পরিবাহী। অথচ তড়িৎ প্রবাহ পরিবাহীর ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় পরিবাহী নিজেই কিছু না কিন্তু বাধা সৃষ্টি করে। দেখা গেছে পরিবাহীর দ্বারা প্রস্তুত তারের প্রস্থচ্ছেদ যত কম হয় তত বেশী বাধা সৃষ্টি করে। এই বাধাকে বলা হয় রোধ।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে হল্যাণ্ডের এক বিজ্ঞানী কামেরলিং ওননেস বাধা সৃষ্টি করবেন এমন এক পরিবাহীর অনুসন্ধানে তৎপর হয়ে ওঠেন এবং উচ্চ ও নিম্ন তাপমাত্রায় পরিবাহীর তড়িৎ পরিবাহিতার কোন পরিবর্তন হয় কিনা তা জানার জন্য পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করেন। একদিন আবিষ্কার করেন উত্তম পরিবাহী পারদের তাপমাত্রাকে 5°2 ডিগ্রী কেলভিনের নিচে নামিয়ে আনলে তড়িৎ প্রবাহে বাধা সৃষ্টি করে না বা যতটুকু করে তা সহজে উপেক্ষা করা যায়।

ওননেসের আবিষ্কারের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং বহু বিজ্ঞানী হাতে নাতে পরীক্ষা করে দেখেন। কিন্তু কারণটা কেউ ব্যাখ্যা করতে পারলেন না। এমনকি ওননেসও নয়। শুধু নিম্ন তাপমাত্রায় পরিবাহীর ঐ গুণের জন্য নাম রাখা হয় অতিপরিবাহিতা এবং ওননেসকে সম্মানিত করা হয় নোবেল পুরস্কার প্রদান করে।

উক্ত ঘটনার পর প্রায় চল্লিশ বছর কেটে যায়। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদ্যুৎপ্রবাহের মাত্রাকে বাড়াতে গিয়ে রোধকে উপেক্ষা করতে অতি পরিবাহীর খোঁজ করেন বিজ্ঞানীরা। এবং পারদ ছাড়াও দু-একটি ধাতুর সন্ধান পান—যেগুলো নিম্ন তাপমাত্রায় রোধ সৃষ্টি করে না বা অতি অল্প পরিমাণে করে। কিন্তু ব্যাখ্যা করতে পারলেন না, কেন সেগুলো নিম্নতাপমাত্রায় এমন অদ্ভুত আচরণ করে?

অবশেষে বার্ডিন ও ফ্রোহলিশ নামে দুজন বিজ্ঞানী বহু গবেষণার পর উভয়ে পৃথক পৃথক ভাবে উপস্থাপিত করেন অতি পরিবাহিতার কারণ, ম্যাক্সপ্ল্যাঙ্কের কণাত্তম তত্ত্ব অনুযায়ী তাঁরা স্থির করেন, চিম্ন তাপমাত্রায় ধাতব কেলাসের মধ্যে এক ধরনের কম্পন শক্তি কাজ করে এবং কেলাসগুলো পরস্পর সংবদ্ধ হওয়ার সুযোগ লাভ করে। ফলে তড়িৎ প্রবাহের দ্বারা যে কম্পন সৃষ্টি হয় তাতে এক একটি শক্তি কণিকা নির্গত হয়।

এই তত্ত্বটিকে এখনও স্বীকার করা হচ্ছে। আবিষ্কারকদের নামের আদ্যক্ষরকে নিয়ে এই তত্ত্বটির নামমরণ করা হয়েছে বি. সি, এস তত্ত্ব। বার্ডিনের "বি", কুপারের "সি" এর শ্রিফারের "এস"।

প্রঃ দিক্‌নির্ণয় যন্ত্র কে আবিষ্কার করেন? সমর কর্মকার জটিয়াদহ ফরিদপুর মুর্শিদাবাদ।

উঃ প্রাচীনকালে চীনদেশই সম্ভবতঃ দিক নির্ণয় যন্ত্র আবিষ্কার করেছিল। কবে এবং কে যে আবিষ্কার করেছিলেন তা ভালভাবে জানা যায় না।

প্রঃ নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাদশ শ্রেণীর এক কিশোর তারকেশ্বর থেকে চিঠি লিখে জানিয়েছো মাধ্যমিকে 726 নম্বর পেয়ে পাশ করার পর একাদশ শ্রেণীতে বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করছো। কিছুকাল আগে কুসংসর্গে পড়ায় স্বাস্থ্য হারিয়েছো, অস্বাভাবিক লম্বা হয়ে গেছো, সব সময় মাথার যন্ত্রণা, পড়তে পার না, অথচ বাবা মার ইচ্ছা Joint-এ যেন বসো।

উঃ তোমার জন্য খুব দুঃখ হচ্ছে। সেই সঙ্গে আনন্দিত হয়েছি—তুমি তোমার ভুল বুঝতে পেরেছো বলে। তুমি কী কুসংসর্গে পড়েছো জানিনা, তবে আজকের নেশা জাতীয় জিনিসে তরুণরা এত বেশী আসক্ত হয়ে উঠেছে যে, দেশের ভবিষ্যতের কথা ভেবে শিউরে উঠতে হচ্ছে। তোমার মত বহু বুদ্ধিমান ছেলে আজ বাবা মাকে লুকিয়ে বিপথে গিয়ে নিজের সর্বনাশ করছে আর পিতামাতার অনন্ত দুঃখের কারণ হচ্ছে।

তুমি যখন ভুল বুঝতে পেরেছো, ভয় তোমার নাই। মানুষে ভুল করে আবার মানুষই সংশোধন করে। মনে সাহস আনো, চিকিৎসককে সব কথা খুলে বলো—সব ঠিক হয়ে যাবে। বাবা-মাকেও তোমার ভুলের কথা বল। তুমি যে লম্বা হয়ে গেছো তার জন্যও ভয় করো না। তোমার বয়সে সবাই এক আধ বছরের মধ্যে হুট করে বেড়ে উঠে। তারপর আর বাড়ে না।

কোন্ বিজ্ঞানকে কি বলে ? অসীম বিশ্বাস

1. Aetiology—কারণ সম্পর্কিত বিজ্ঞান।
2. Agrostology—গ্যাস সম্পর্কিত বিজ্ঞান।
3. Anthropology—মানুষের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কিত বিজ্ঞান।
4. Arachnology—মাকড়শা সম্পর্কিত বিজ্ঞান।
5. Avenology—বায়ুপ্রবাহ সংক্রান্ত বিজ্ঞান।
6. Astrology—জ্যোতিষশাস্ত্র সংক্রান্ত বিজ্ঞান।
7. Bacteriology—জীবাণু সংক্রান্ত বিজ্ঞান।
8. Biology—জীব সংক্রান্ত বিজ্ঞান।
9. Cardeology—হৃদ্‌যন্ত্র ও তার কাজ সংক্রান্ত বিজ্ঞান।
10. Cartology—ম্যাপ ও চার্ট সংক্রান্ত বিজ্ঞান।
11. Christology—খ্রীষ্টধর্ম সংক্রান্ত বিজ্ঞান।
12. Conchology—খোলাযুক্ত মৎস (কচ্ছপ) সংক্রান্ত বিজ্ঞান।
13. Cosmology—বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কিত বিজ্ঞান।
14. Criminology—অপরাধ সংক্রান্ত বিজ্ঞান।
15. Dendrology—গাছ সংক্রান্ত বিজ্ঞান।
16. Ecology—পরিবেশ ও জীবের সম্বন্ধে সংক্রান্ত বিজ্ঞান।
17. Embryology—ভ্রূণ সংক্রান্ত বিজ্ঞান।
18. Entomology—পতঙ্গ সম্পর্কিত বিজ্ঞান।
19. Ethnology—মানবজাতি সংক্রান্ত বিজ্ঞান।
20. Etiology—কারণ অনুসন্ধান সংক্রান্ত বিজ্ঞান।
21. Ethology—চরিত্রগঠন সংক্রান্ত বিজ্ঞান।
22. Fycology—শৈবাল সংক্রান্ত বিজ্ঞান।
23. Gastrology—রন্ধন সম্পর্কিত বিজ্ঞান।
24. Genealogy—বংশ সম্পর্কিত বিজ্ঞান।
25. Geology—ভূমি সংক্রান্ত বিজ্ঞান।
26. Gerontology—বয়োবৃদ্ধি সংক্রান্ত বিজ্ঞান।
27. Graphology—হস্তাক্ষর সম্পর্কিত বিজ্ঞান।
28. Gynoecology—স্ত্রীরোগ সম্পর্কিত বিজ্ঞান।
29. Haematology—রক্ত সম্পর্কিত বিজ্ঞান।
30. Heliology সূর্য সম্পর্কিত বিজ্ঞান।
31. Histology—দেহতন্তু সম্পর্কিত বিজ্ঞান।
32. Homology—সমসংস্থ সম্পর্কিত বিজ্ঞান।
33. Horology—সময় সংক্রান্ত বিজ্ঞান।
34. Hydrology—জল সম্পর্কিত বিজ্ঞান।
35. Hystology—কোষের গঠন সংক্রান্ত বিজ্ঞান।
36. Hyphology—নিদ্রা সম্পর্কিত বিজ্ঞান।
37. Limnology—হ্রদ সম্পর্কিত বিজ্ঞান।
38. Meteorology—আবহাওয়া সংক্রান্তবিজ্ঞান।
39. Methodology—নিয়ম সম্পর্কিত বিজ্ঞান।
40. Morphology—উদ্ভিদ ও প্রাণীর আকার ও দেহ গঠন সংক্রান্ত বিজ্ঞান।
41. Mycrology—অণু সংক্রান্ত বিজ্ঞান।
42. Mycalogy—ফাঙ্গি পঠনপাঠন সম্পর্কিত বিজ্ঞান।
43. Myrmecology—পিঁপড়া সম্পর্কিত বিজ্ঞান।
44. Mythology—পুরাণ সম্পর্কিত বিজ্ঞান।
45. Neology—শব্দের উৎপত্তি সংক্রান্ত বিজ্ঞান
46. Nephology—মেঘ সম্পর্কিত বিজ্ঞান।
47. Nosology—রোগের শ্রেণী বিভাগ সংক্রান্ত বিজ্ঞান।
48. Oucology—ক্যানসার রোগ সম্পর্কিত বিজ্ঞান।
49. Oneirology—স্বপ্ন সংক্রান্ত বিজ্ঞান।
50. Outology—তত্ত্ব সম্পর্কিত বিজ্ঞান।
51. Ophiology—সাপ সংক্রান্ত বিজ্ঞান।
52. Orology—পর্বত সংক্রান্ত বিজ্ঞান।
53. Ornithology—পক্ষি সম্পর্কিত বিজ্ঞান।
54. Osteology—অস্থি সম্পর্কিত বিজ্ঞান।
55. Palaeontology—জীবাশ্ম সম্পর্কিত বিজ্ঞান
56. Palynology—রেণু সম্পর্কিত বিজ্ঞান।
57. Petrology—শিলা সম্পর্কিত বিজ্ঞান।
58. Phonology—ধ্বনি সংক্রান্ত বিজ্ঞান।

বগুলা কলেজ, বগুলা, নদীয়া, পিন 741502

ননীগোপাল মণ্ডল

যাদু বা ম্যাজিক দেখতে কে না ভালবাসে। ম্যাজিক দেখে বাড়ি এসে সবাই ম্যাজিসিয়ান হয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিতে চায়। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আমরা বুঝি না এই যাদু জিনিসটা কি ? অনেকে বলেন ভোজবাজী, ম্যাসমেরিজ্‌ম্‌, মন্ত্র তন্ত্র ইত্যাদি। আসলে কিন্তু, এই সকল ম্যাজিকের বেশীর ভাগই বিজ্ঞানের ব্যবহার এবং অতি-দ্রুত হাতের কাজ। আজ কয়েকটি যাদু বা ম্যাজিক সম্বন্ধে আলোচনা করব যার প্রত্যেকটির পিছনে আছে রসায়ন বিদ্যার (Chemistry) সূক্ষ্ম অবদান।

হাতকাটা :—

এই খেলা দেখানোর জন্য (i) পাঁচগ্রাম পরিমান পটাসিয়াম থায়োসায়ানেট এবং (ii) সমপরিমান ফেরিক ক্লোরাইড প্রয়োজন। প্রথমে আলাদা ভাবে পটাসিয়াম থায়োসায়ানানেট এবং ফেরিক ক্লোরাইডের সংপৃক্ত জলীয় দ্রবণ তৈরি করতে হবে। এরপর একটি চকচকে চাকুকে পটা-সিয়াম থায়োসায়ানেটের দ্রবণে ডোবাতে হবে এবং হাতকাটার ম্যাজিক হাতের যে অংশে দেখানো হবে সেখানে ফেরিক ক্লোরাইড দ্রবণ লাগাতে হবে। এরপর নানা বক্তৃতার পর চাকুটা হাতের নির্দিষ্ট স্থানে লাগালেই হাতটা লাল হয়ে যাবে। মুখের ভঙ্গিমার পরিবর্তন করে উঃ আঃ করলে সবাই ভাববে হাত কেটে রক্ত বেরিয়েছে।

পটাসিয়াম থায়োসায়ানেটের সঙ্গে ফেরিক ক্লোরাইডের বিক্রিয়ায় ফেরিক আয়রন লাল রং সৃষ্টি ক'রে নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ করে।

কালো ফেনা :—

আমরা সবাই জানি সাবানের ফেনা সব সময়ে সাদা হয়। কিন্তু কালো ফেনার নাম আমরা শুনি না। এই ম্যাজিক-এর জন্য (i) 25 c.c. ঘন সালফিউরিক অ্যাসিড, (ii) 50 গ্রাম চিনি (iii) দুটো বড় বীকার (কাঁচের) এবং (iv) জল প্রয়োজন। একটি বীকারে 50 গ্রাম চিনির সঙ্গে 40 c.c. জল দিয়ে চিনির দ্রবন তৈরি করতে হবে এবং অপর বীকারে নিতে হবে ঘন সালফিউরিক অ্যাসিড। এরপর ধীরে ধীরে চিনির দ্রবণের সঙ্গে সালফিউরিক অ্যাসিডটা মেশাতে হবে। দেখা যাবে দুটো স্বচ্ছ দ্রবণ থেকে কালো ফেনা উপচে বেরিয়ে আসছে। যেটা সাবানের ফেনার মতো বুদবুদাকার।

চিনির মধ্যে আছে কার্বন, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন। ঘন সালফিউরিক অ্যাসিডের সংস্পর্শে এসে চিনির ভিতরকার হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন আলাদা হয়ে যায়। অপর দিকে কার্বন তার নিজ বর্ণ (কালো) ধারণ করে। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন দ্বারা সৃষ্ট বুদবুদে এই কার্বনের কালো গুঁড়া-গুলো মিশে কালো ফেনায় রূপান্তরিত হয়।

জলে জ্বলে আগুন :

আমাদের একটা ধারনা আছে, আগুনের উপর জল ফেললে আগুন নিভে যায়। কিন্তু জল (জলের মত জিনিস) পড়ে আগুন জ্বলে, এর কথা আমরা জানি না।

এই খেলা দেখানোর জন্য (i) লাল ক্রোমিক অ্যান-হাইড্রাইড-এর কয়েকটি টুকরা (ii) খানিকটা ইথাইল অ্যালকোহল, (iii) বড় একটা অ্যাস্‌বেস্‌টস্‌ বোর্ড প্রয়োজন। প্রথমে অ্যাস্‌বেস্‌টস্‌ বোর্ডের উপর ক্রোমিক অ্যানহাইড্রাইডের টুকরোগুলো ছড়িয়ে রাখতে হবে। পরে গেলাস থেকে ইথাইল অ্যালকোহল এমন ভাব করে ঐ ক্রমিক অ্যানহাইড্রাইডের উপর ফেলতে হবে যেন জল ফেলা হচ্ছে। দেখা যাবে সঙ্গে সঙ্গে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠবে।

ক্রোমিক অ্যানহাইড্রাইডের সঙ্গে ইথাইল অ্যালকোহলের বিক্রিয়ায় প্রচণ্ড তাপ উৎপন্ন হয় যার ফলে ইথাইল অ্যাল-কোহল জ্বলে উঠে।

গ্রাম : বামনসরিষা, পোঃ-লালনগর, মেদনীপুর।

কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ

এবার থেকে প্রতি মাসেই বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সফল প্রতিযোগীদের উপহার ও পুরস্কারের কুপন বাড়ির ঠিকানায় পাঠানো হবে এবং প্রাপকদের দপ্তর থেকে পুরস্কার ও উপহার গ্রহণ করতে হবে। —পরিচালক

গত 29শে জুলাই '89 কিশোর বিজ্ঞান পত্রিকার দপ্তরে কিশোর বিজ্ঞান পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ডঃ মৃণাল কুমার দাশগুপ্ত। ঐ সভায় স্থির হয় যে এখন থেকে "কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ" এর আনুষ্ঠানিকভাবে সদস্য গ্রহণ করা হবে। সাধারণ সদস্যদের জন্য ধার্য করা হয়েছে বার্ষিক দশ টাকা চাঁদা এবং স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে চাঁদার হার বার্ষিক মাত্র পাঁচ টাকা। আজীবন সদস্যদের ক্ষেত্রে চাঁদা এককালীন দুইশত টাকা। সদস্যগণ কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ আয়োজিত নানা অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে পারবেন।

জনমানসে বিজ্ঞান মানসিকতা প্রচারে অবিলম্বে কয়েকটি কর্মসূচী গ্রহণ সভ্য-সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যাপারে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভায় সমরজিৎ করে, জয়ন্ত দত্ত, অরুপরতন ভট্টাচার্য, অমরনাথ রায়, দিলীপ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অধীর চক্রবর্তী, রবীন বল, প্রমুখেরা উপস্থিত ছিলেন। সদস্য হওয়ার চাঁদা নিচের ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

কোষাধ্যক্ষ বা কর্মসচিব, "কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ" 8/1, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-7000089।

সফল উত্তরদাতাদের নাম

জুলাই '89-এ প্রকাশিত আই-কিউ-টেস্ট-এর সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে (আগে আসার ভিত্তিতে) যে দশজন সার্টিফিকেট পাবে :

1. **শিবানী ভৌমিক,** প্রযত্নে, পি. কে. ভৌমিক, 146/A, কাইজার স্ট্রীট কলকাতা-700 009। 2. **উৎপল বসু,** প্রযত্নে, উদয় বসু, গ্রাম+পোস্ট-হরিনাভি, জেলা দঃ 24 পরগণা পিন-753 359। 3. **বিশ্বপ্রিয় চন্দ্র,** প্রযত্নে, গৌরহরি দাস, লালকুঠি পাড়া, পোস্ট-সিউড়ি, জেলা-বীরভূম পিন-731 101। 4. **শুভাশিস বিশ্বাস,** বগুলা কলেজ পাড়া, পোস্ট-বগুলা, জেলা-নদীয়া, পিন-741 502। 5. **তন্ময় মহাপাত্র,** 56F, বেলেঘাটা মেইন রোড, কলকাতা-700 010। 6. **ইন্দ্রজিৎ মুখার্জী,** প্রযত্নে, এস. পি. মুখার্জী, সি. ইউ. টি. কোয়ার্টার ফ্ল্যাট নং-A5 P1/7 সি. আই. টি. স্কীম, কলকাতা-700 054। 7. **অরিন্দম চন্দ্র,** ফ্ল্যাট নং B/2, ক্লাস্টার-XI, পূর্বাচল, সেক্টর-3, সল্টলেক, কলকাতা-700 091। 8. **মোহিত সাহা,** প্রযত্নে, জহর সাহা, বোলপুর, মিশন কম্পাউন্ড, পিন-731 204। 9 **রূপাঞ্জন সাহা,** প্রযত্নে, রবীন্দ্রকুমার সাহা, কে. জি. এঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট পোস্ট-বিষ্ণুপুর, জেলা-বাঁকুড়া, পিন-722122। 10. **রুনু নিয়োগী :** প্রযত্নে, রবীন্দ্রনাথ নিয়োগী, গ্রাম-পানপুর, পোস্ট-নারায়ণপুর, জেলা উঃ 24-পরগনা, পিন-743 126।

জুলাই '89-এ প্রকাশিত কুইজ কনটেস্ট গ্রেড-I-এর সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে (আগে আসার ভিত্তিতে) যে তিনজন পুরস্কার পাবে :

1. **কল্লোল রায়,** প্রযত্নে, কমলেশচন্দ্র রায়, গ্রাম-নওয়াপাড়া, পোস্ট-সোনারপুর, জেলা-দঃ 24 পরগণা, পিন-743 369। 2. **সোনালী রায়,** প্রযত্নে, সুধীর কুমার রায়, ইন্দা, (টায়ার হাউসের কাছে), পোস্ট খড়্গপুর, জেলা-মেদিনীপুর। 3. **পল্লব ব্যানার্জী,** প্রযত্নে, সুভাষ ব্যানার্জী, গ্রাম+পোস্ট-শাঁখরাইল, জেলা-হাওড়া, পিন-711 383।

জুলাই '89-এ প্রকাশিত কুইজ কনটেস্ট গ্রেড-I-এর সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর আরও যারা দিতে পেরেছে :

কলকাতা : অভিজিৎ সরকার, দেবাদিত্য ঘোষ, শিবানী ভৌমিক। **হুগলী :** মিলটন সরকার, ইন্দ্রজিৎ দত্ত। **নদীয়া :** অমল বিশ্বাস। **মেদিনীপুর :** শোভনলাল পণ্ডা। **বাঁকুড়া :** পত্রলেখা মুখার্জী, অনির্বাণ কর, জয়দীপকুমার সাহা। **কোচবিহার :** পূর্ণেন্দু চক্রবর্তী।

জুলাই '89-এ প্রকাশিত কুইজ কনটেস্ট গ্রেড-II এর সবাধিক নয়টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে (আগে আসার ভিত্তিতে) যে তিন জন পুরস্কার পাবে :

1. **অনির্বাণ মণ্ডল,** FD-217/6, সেক্টর-3, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-7000 091। 2. **রূপাঞ্জন সাহা,** প্রযত্নে, রবীন্দ্রকুমার সাহা, কে. জি. এঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট, পোস্ট-বিষ্ণুপুর, জেলা-বাঁকুড়া, পিন-722 122। 3. **পিনাকী দত্ত,** প্রযত্নে, নিখিলকুমার দত্ত, পোস্ট-কাঁচরাপাড়া, জেলা-উঃ 24 পরগণা।

বিশোর বিজ্ঞান পরিষদের সভায় বক্তৃতারত পরিষদ সভাপতি ডঃ মৃণাল কুমার দাসগুপ্ত। বাঁদিকে সমরজিৎ কর এবং বিশিষ্ট সদস্যবৃন্দ। **ছবি ঃ শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায়**

জুলাই '89-এ প্রকাশিত ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড-II-এর নয়টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর আরও যারা দিতে পেরেছে ঃ

কলকাতা ঃ নৈমীনাথ গাঙ্গুলী, দেবরাজ দত্ত। **24 পরগণা ঃ** মলয় কুমার নস্কর, সুমন পাল, উৎপল বসু, সঞ্জয় কুমার কর্মকার, সুব্রত মজুমদার, অঞ্জন চক্রবর্তী, কুন্তল মণ্ডল, নরোত্তম ডেকো, অরিন্দম মান্না। **হাওড়া ঃ** রাখী পাল, তন্ময় চক্রবর্তী, সৌমেন চ্যাটার্জী, ছন্দা নাথ, প্রণতি রায়, শুভাশিস সরকার। **হুগলী ঃ** অপর্ণা সাঁতরা, জলি সাহা, মিলটন সরকার। **মেদিনীপুর ঃ** সঞ্জয় দে, অগ্নিশ্বর গিরি গোস্বামী, কৌশিক গিরি, দেবানন্দ মাজী, তরুণ কুমার বেরা, তরুণ মল্লিক। **বর্ধমান ঃ** সুশান্ত কুমার মাল, সর্বেন্দু সেন, তারাপদ রায়, তর্ক প্রতিম লাহা। **নদীয়া ঃ** চিত্রা মণ্ডল, অসীম বিশ্বাস, প্রসেনজিৎ ঝাঁ। **বীরভূম ঃ** অমিতাভ দাসগুপ্ত, কল্লোল চ্যাটার্জী, আলোক চক্রবর্তী, বিশ্বপ্রিয় চন্দ্র। **বাঁকুড়া ঃ** হিমাচল মুখার্জী, সজীব বিশ্বাস, স্মরজিত কুণ্ডু, অংশুমান কর। **মুর্শিদাবাদ ঃ** অতীন রায়। **জলপাইগুড়ি ঃ** শর্মিষ্ঠা ঘোষ।

জুলাই '89-এ প্রকাশিত ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড-III-এর সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে (আগে আসার ভিত্তিতে) যে তিনজন পুরস্কার পাবে ঃ

1. **মানব পিলসিমা,** 54, গৌরাঙ্গতলা, পোস্ট-খাগড়া, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন-742 103। 2. **রুপু নিয়োগী,** প্রযত্নে, রবীন্দ্রনাথ নিয়োগী, গ্রাম-পানপুর, পোস্ট-নারায়ণপুর, জেলা-উঃ 24-পরগণা, পিন-743 126। 3. **মনোজিৎ দত্ত** প্রযত্নে, রঞ্জিত দত্ত, হসপিটাল কোয়ার্টার্স কারবালা, বিল্ডিং-2, ফ্ল্যাট-9 পোস্ট + জেলা-হুগলী।

জুলাই '89 এ প্রকাশিত ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড-III-এর সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর আরও যারা দিতে পেরেছে ঃ

24-পরগণা ঃ মিনতী ঘোষ। **হুগলী ঃ** শান্তনু মিত্র। **মেদিনীপুর ঃ** সুজন বন্ধু সামন্ত। **বর্ধমান ঃ** সুখেন্দু বিকাশ চৌধুরী, পার্থ প্রতিম লাহা, আলোদীপা লাহা, কুন্তল রেজ। **সিংভূম, বিহার ঃ** সুমন কুমার সাধু, সুপ্রিয় কুমার সাধু।

ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড—I II III-এর উপহার

সবকটি প্রশ্ন বা সর্বাধিক প্রশ্নের সঠিক উত্তর দানের ভিত্তিতে (আগে আসার ভিত্তিতে) প্রথম তিনজনকে পুরস্কৃত করা হবে। তিনজনেরই পুরস্কারের মূল্যমান সমান।

আই-কিউ-টেস্টের সফল উত্তর-দাতাদের আগে আসার ভিত্তিতে 10টি সার্টিফিকেট দেওয়া হবে।

সেপ্টেম্বর '89 সংখ্যার ক্যুইজ কনটেস্টের উপহার

গ্রেড-1 **সমীর কুমার ঘোষ**
আরও ফিজিক্স ক্যুইজ

গ্রেড-2 **অমরনাথ রায়ের**
আরও সায়েন্স ক্যুইজ

গ্রেড-3 **রতন মোহন খাঁ**
আরও গণিত ক্যুইজ

প্রতিযোগিতার কুপন

ক্যুইজ কনটেস্ট—1/2/3 এবং আই কিউ টেস্টে উত্তরের সঙ্গে এই কুপনটি কেটে পাঠাতে হবে।

আমি.....

.....

বাড়ির ঠিকানা.....

.....

বয়স..... শ্রেণী .....

বিদ্যালয়ের নাম .....

.....

আই কিউ টেস্ট / ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড 1/2/3-এর উত্তর পাঠালাম।

ইলেকট্রিক কম্বিনেশন লক

বিশ্বজিৎ ঘোষ

ভাই বোনের ঝগড়া ও নিতান্ত পারিবারিক অশান্তি মেটাতেই আমাকে একটা ইলেকট্রিক কম্বিনেশন লক তৈরি করতে হয়েছিল। আজ সেটা নিয়ে আলোচনা করব।

প্রথমে বলি বাপু, এ জিনিসটি কিন্তু সম্পূর্ণ আমার কল্পনা প্রসূত। এবং নিরাপত্তা ও নির্ভর যোগ্যতার দিক দিয়ে একেবারে ফার্স্টক্লাস। সর্বোপরি অনধিকার প্রবেশ কারী খুঁড়ি কম্বিনেশন কোড্ অজানা কোন লোককে বা লোকের দারুণ ঘাবড়ে দেওয়ার পক্ষে একেবারে সুপার-ফার্স্টক্লাস টু-দি-পাওয়ার-ইনফিনিটিও। এবার বলি লকটা কেমন হবে। ধরো তুমি কোথাও যাচ্ছো। যাবার সময় দরজাটা লক করলে। লক করার পর ডায়ালটা ঘুরিয়ে-ঘারিয়ে উল্টো-পাল্টা করে রেখে চলে গেলে। এইবার কোনো লোক, কোড কম্বিনেশন জানে না দরজার সামনে এলো। প্রথম কথা—সে যদি কম্বিনেশন তালা কি সেটা না জানে তাহলে চকরা-বকরা চাকা সমেত এই রকম তালা দেখেই ঘাবড়ে যাবে। ধরো লোকটার কম্বিনেশন লক সম্বন্ধে জ্ঞান আছে। প্রথমে সে চাকা ঘোরাতে আরম্ভ করল। পাঁচটা চাকাই তার আন্দাজমত কম্বিনেশন ঠিক করল। তারপর দরজায় ধাক্কাধাক্কি করলেও দরজা খুলল না। ইতিমধ্যে সে দরজার একপাশে একটা লুকানো সুইচের সন্ধান পেয়ে গেছে। কেল্লা প্রায় ফতে বলে ভেবে যেই না সুইচটা টেপা অমনি প্রচণ্ড জোরে সাইরেন (অবশ্য যদি তার করা কম্বিনেশন ভুল হয়)। তারপর আর কি। যঃ পলায়তি স জীবতি।

এই জটিল লক সিস্টেমটির কাজ কৈবলমাত্র বৈদ্যুতিক বর্তনীর স্টেটটাফ ইলেক্ট্রিক সারকিউরিটির উপরই নির্ভর-শীল। এটা বহুকাজেই, বহুক্ষেত্রেই ব্যবহার করা যায়। যেমন কম্বিনেশন লকের ইনপুট বাড়ির AC লাইনের সঙ্গে এবং আউটপুট তোমার হাম ট্রান্সমিটার; CB রিপ; টিভি সেট ইত্যাদি ইত্যাদি তোমার পছন্দমত যে কোন জিনিসেই লাগিয়ে দেওয়া যায় যদি এটা AC OUTLET আর প্রয়োগ বস্তুয় (রেডিও, টিভি, ইত্যাদির) মাঝে লকবক্স (LOCK-BOX) দিয়ে স্থায়ী ভাবে আটকে দেওয়া যায় তবে গোপন কম্বিনেশন না জানলে একে খোলা একেবারেই অসম্ভব।

ব্লক ডায়াগ্রাম দেখে বোঝাই যাচ্ছে ব্যাপারটা জলের মত সোজা। কণ্ট্রোল প্যানেলে সুইচগুলো যেমন ভাবে বসানো আছে ঠিক তেমন ভাবে বসাতে হবে। খটকা লাগছে শুনে!!—কোনও ব্যাপারই নয়, দুটো সুইচ থাকবে প্রথম সারিতে, পরের দুটো সুইচ থাকবে তার পরের সারিতে এবং শেষ সুইচটা থাকবে দ্বিতীয় সারির মাঝখানের একটু নীচের দিকে। যদি কেউ কম্বিনেশন না জেনে উপরের বাঁদিকের সুইচ বা ডায়াল এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে ঘোরাতে আরম্ভ করে তবে দিন-ভোর ঘুরিয়ে প্রায় পাঁচ-হপ্তা লাগবে তালা খুলতে। ছবিতে যে সার্কিটটা দেওয়া আছে (S_1) থেকে পড়লে (অবশ্য এ সম্বন্ধে অর্থাৎ সুইচ নাম্বার সম্বন্ধে তোমাকে আগে থেকেই ভালভাবে অবহিত থাকতে হবে) এটার কম্বিনেশন দাঁড়াচ্ছে গিয়ে 4—11—1—9—13. এই সকল নম্বর গুলো ডায়াল করা সত্ত্বেও কিন্তু তালা খুলবে না। অতিরিক্ত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা হিসাবে (S_6) বসানো হয়েছে। এটার নাম দেব RESET. সমস্ত কম্বিনেশন ডায়াল করার পর এটা টিপতে হবে। এই (S_6) কে লুকিয়ে রাখতে পারলে সব থেকে ভালো হয়। দরজার একপাশে কি অন্য একপাশে একটা ড্রিল দিয়ে (S_6)-এর সমান গর্ত করে (S_6) কে বসানো হলো। খেয়াল থাকে যেন সুইচ এবং দরজার উপরিতল বা লেভেল এক থাকে। সুইচ লাগানো হয়ে গেলে সুইচের উপরটা দরজার রং-এর মত রং করে দেবে। সুইচটার কথা কেবলমাত্র তুমিই জানবে। (S_6) একটা সাধারণ অবস্থায় খোলা একটা পুশ বাটন সুইচ ছাড়া আর কিছুই নয়। সাবমিনিয়েচার পুশ বাটন সুইচ ব্যবহার করলে হাতের কাছে একটা সরু দস্তাকার জিনিস রাখতে হবে ওটাকে টেপার জন্য।

এই গেল আসল যন্ত্রের ব্যাপার; এবার কাছাকাছি কোনও হার্ডওয়ারের দোকান থেকে সলিনয়েড চালিত একটা তালা কিনে নিয়ে এসো আর দরজার উপর ভিতরের দিকে সেট করে ফেলো সলিনয়েড তালাগুলোর কেউ কেউ 6v DC তে চলে আবার অনেকে 240VAC-তেও চলে। এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় প্রকার তালা কিনলেই সুবিধা।

এবার আসি, 'একস্ট্রাফে- সিলিটি' জ অব ইলেক্ট্রিক কম্বিনেশান লক-এর প্রসঙ্গে। এত সুন্দর একটা লক তৈরী হলো আর তাতে একটা অ্যালাম থাকবে না, ডিসপ্লে বোর্ড থাকবে না—ব্যাপারটা কেমন যেন ফাঁকা-ফাঁকা লাগছে। একটা চোদ্দ কি পনেরো টাকা দামের অ্যাঙ্কর

কি অন্য যে কোন কোম্পানীর কিরিং-মিরিং কলিং বেল কিনে নিয়ে এসো। এর একটা পয়েন্ট COMMON লাইনের সঙ্গে যুক্ত করো আর অন্যটা পাঁচটা সুইচের 4, 11, 1, 9, 13 এই নম্বরের পয়েন্ট কটা বাদ দিয়ে প্রত্যেকটার সঙ্গে যোগ করো। তারপর পয়েন্টগুলো ভালভাবে সল্ডার করে দাও। ব্যাস, অ্যালার্ম তৈরি। বাকি রইলো ডিস্‌প্লে বার্ড—কিছুই নয়, একটা কাঠ বোর্ডের মাঝখানে WELCOME লেখার হরফে গর্ত করো। ভিতর দিক থেকে লাল সেলোফিন কাগজ আঠা দিয়ে লাগিয়ে দাও। এবার একটা 25W 240V-এর বাল্ব নিয়ে একটা প্রান্ত COMMON ও অপর প্রান্ত (S_6)-এর মুক্ত প্রান্তে আটকে দিয়ে সল্ডার করে ফেলো।

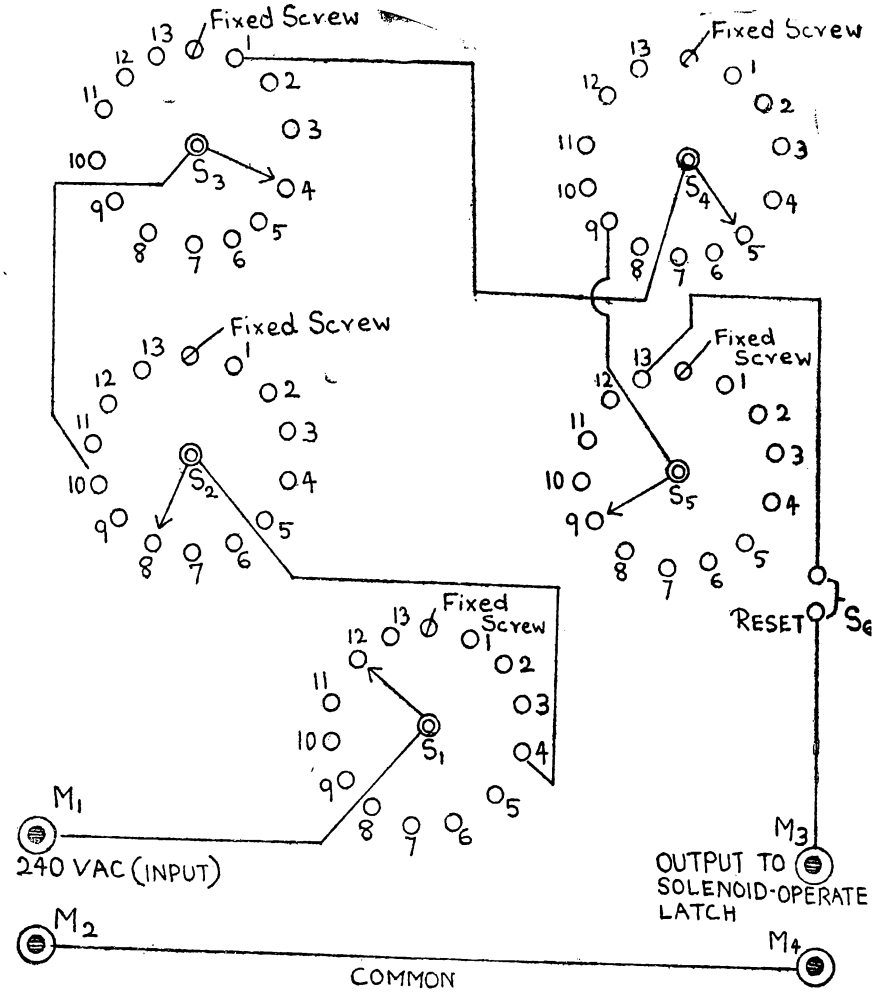

এইবার বলি, ইলেক্‌ট্রিক কম্বিনেশন লকের সকল সম্ভাব্য কম্বিনেশন-এর সংখ্যা হলো তিন লক্ষ, একাত্তর হাজার দুশো তিরানব্বইটা অর্থাৎ কেউ যদি না জেনে তালা খুলতে যায় তবে তাকে তিনলক্ষ একাত্তর হাজার দুশো তিরানব্বই বার চেষ্টা করে দেখতে হবে। ইচ্ছে করলে পাঁচটা CHANNEL সুইচ ব্যবহার না করে চারটে, তিনটে বা দুটো ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে কম্বিনেশন সংখ্যা অনেক কমে যাবে 4টে সুইচের ক্ষেত্রে কম্বিনেশন সংখ্যা হবে 28561, তিনটের ক্ষেত্রে 2197টি আর দুটো সুইচের বেলায় 169টি।

কম্পোনেন্ট লিস্ট,

TV CHANNEL সুইচ	—5টি (4টি, 3টি বা 2টি হতে পারে)	
DPDT	„	—1টি
সলিনয়েড তালা	„	—1টি
জ্যাক	„	—4টি
বাল্ব	„	—1টি
সেলোফিন কাগজ	„	—1টি
পিচবোর্ড	„	—1টি
সল্ডার	„	—2 গজ

এছাড়া তার, নাট. স্ক্রু, আঠা, ড্রিলিং-মেসিন ইত্যাদি লাগবে।

মিঠাপুকুর বর্ধমান।

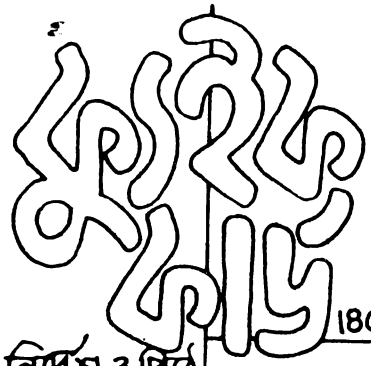

ক্যুইক কার্ড

180

নির্দেশ ও পিঠে

ক্যুইক কার্ড
তোমার বুদ্ধি,
চিন্তা আর
তৎপরতা মাপে

160

এখানে তুমি
কার্ডটি পড়তে
দেখছো, ধরার
চিন্তা করছো
এবং আঙ্গুলের
কাজ করছো

140

মনে রেখো
এখানে যতগুলি
কাজ করছো
তার মধ্যে
চিন্তা করার
কাজে স
চেয়ে
স'

শারদীয় উপহার
কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান
1989

পরিকল্পনা
সমীর মণ্ডল

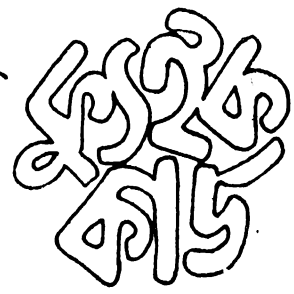

ক্যুইক কার্ড

নির্দেশ :

তোমার বন্ধু প্রথমে ক্যুইক
কার্ড-এর মাথায় দু আঙ্গুলে
ধরে কার্ডটি ঝুলিয়ে রাখবে

তুমি তোমার বুড়ো আঙ্গুল
বং তার পাশের আঙ্গুল
য় দু আঙ্গুলে কার্ডটি
জন্য প্রস্তুত থাকবে।
' আঙ্গুল থাকবে
একেবারে নীচে
রু' লেখা।
আঙ্গুলের মধ্যে
াক থাকবে।

'মাকে না
সময়ে
। এবং
' ফেলবে

েখো।

জ্ঞান ও আনন্দের আশ্চর্য সমীকরণ

শারদীয়

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

পুজোর ছুটি ফুরিয়ে গেলেও যে বইয়ের প্রয়োজন ফুরোয় না।

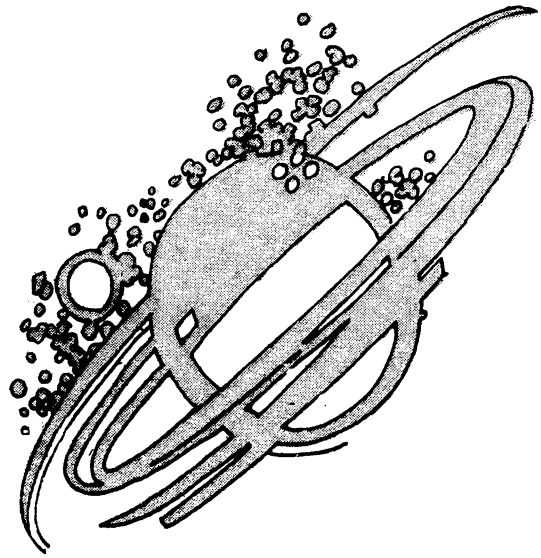

পুজো সংখ্যায় নির্বাচিত

প্রবন্ধগুচ্ছ : বিপন্ন প্রাণিজগত

লিখবেন : নারায়ণ সান্যাল ॥ রতনলাল ব্রহ্মচারী ॥ অজয় হোম ॥ তারক মোহন দাস ॥ সুবীর দত্ত ও অনেকে

বিশ্বখ্যাত লেখকের দুটি সায়েন্স ফিকশান অনুবাদ করবেন

এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায় ও সৌরেণ ভট্টাচার্য

দশটি দুর্দ্ধর্ষ মজার এক্সপেরিমেন্ট উপহার দেবেন

সন্তোষ মিত্র ॥ সমীর কুমার ঘোষ ॥ অপরাজিত বসু ॥ অমরনাথ রায় ॥ দিবাকর সেন ও আরও অনেকে

দিলীপ দাস ও গৌতম কর্মকারের দীর্ঘ চিত্র কাহিনীর সঙ্গে থাকছে—রেবতীভূষণ ও শৈল চক্রবর্ত্তীর কার্টুন

এছাড়া, সুপার ক্যুইজ, আই কিউ টেস্ট, বুদ্ধিশুদ্ধিপ্রতিযোগিতা তো থাকছেই—সেই সঙ্গে থাকছে অসংখ্য পুরস্কার।

প্রস্তুতি শুরু হয়েছে

বেরুবে পুজোর আগেই

স্টুডেন্ট সায়েন্স এনসাইক্লোপিডিয়া

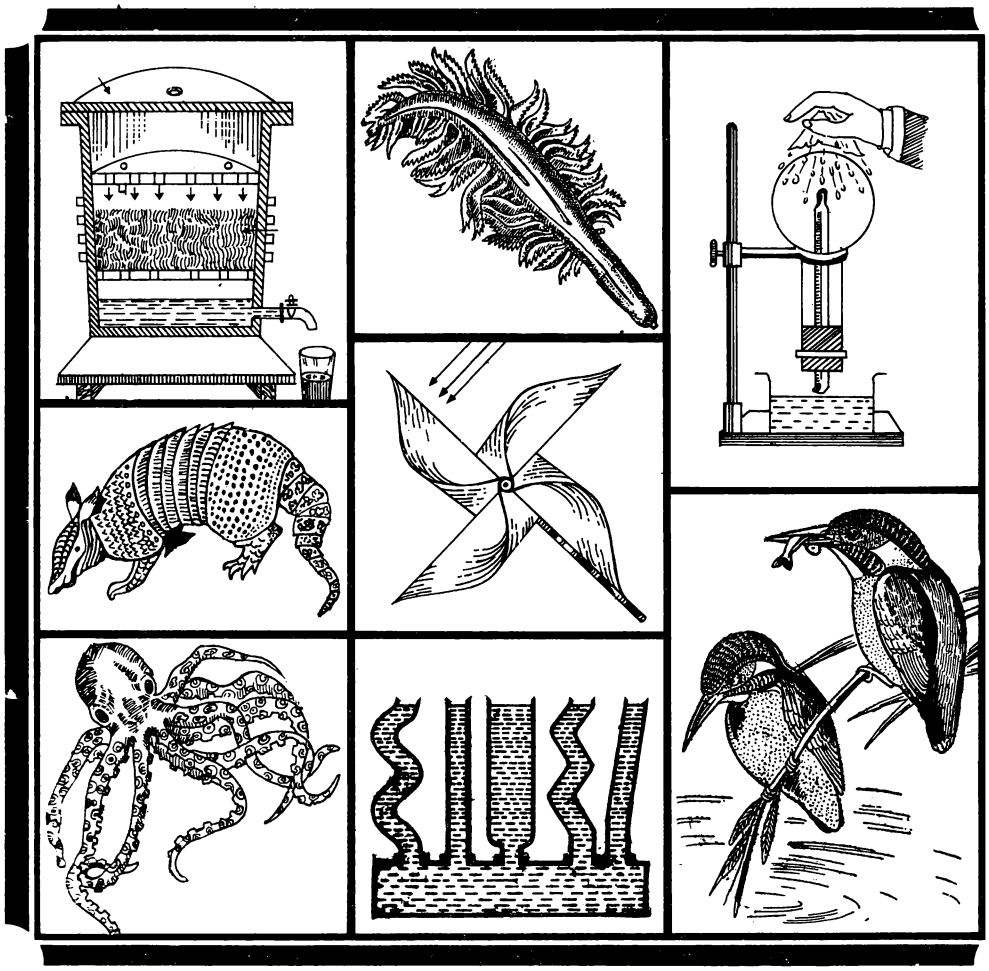

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ● ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯ ।

R/NO 37390/81 KISHORE JNAN BIJNAN Regd. No. WBEC 316 Sept '89 9th yr VOL 6

ক্লাসিক বিজ্ঞান সাহিত্য

আধুনিক ভারতের বিজ্ঞান চর্চার প্রাণপুরুষ আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুর বহুমুখী প্রতিভার একটি অন্যতম প্রতিভা তাঁর সাহিত্য রচনা। জগদীশ চন্দ্রের প্রথম বাংলা গ্রন্থ 'অব্যক্ত' প্রকাশিত হয় ১৩২৮ সালে। কিন্তু জগদীশ চন্দ্রের বাংলা রচনার সংখ্যা অনেক। কিশোরদের জন্যে লেখা রচনার সংখ্যাও কম নয়। সে সমস্ত রচনাই বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ছড়িয়ে রয়েছে। আজকের এই বিজ্ঞান ও প্রগতির যুগে জগদীশ চন্দ্রের রচনাবলীর সঙ্গে কিশোরদের পরিচিত করিয়ে দেবার উদ্দেশ্যেই প্রকাশিত হচ্ছে—কিশোর রচনা সমগ্র। গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন দিবাকর সেন। বহু দুষ্প্রাপ্য ফটো ও অপ্রকাশিত পত্রাবলী সহ গ্রন্থটির দাম মাত্র ১৫ ।

জগদীশ চন্দ্র বসু **কিশোর রচনা সমগ্র**

আধুনিক ভারতীয় রসায়ন বিজ্ঞানের জনক আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের কর্মবহুল জীবনের অনেক সময়ই কেটেছে সমাজ সেবায়, জাতি গঠনে ও দেশকে স্বয়ম্ভর করে তোলায়। শুধু তাইই নয়, বিজ্ঞানকে জনপ্রিয়করণে ও জাতি গঠনে তিনি লেখনীও ধরেছেন—লিখেছেন নানা প্রবন্ধ। কিন্তু সেইসব সার্থক রচনা অপ্রকাশিত চিঠিপত্র, দুষ্প্রাপ্য ফটোগ্রাফ্ সম্বলিত গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন বিভাবসু ঘোষ। দাম ১৫

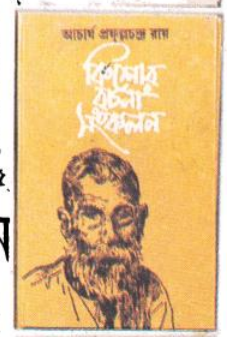

প্রফুল্ল চন্দ্র রায় **কিশোর রচনা সঙ্কলন**

জনপ্রিয় স্তরে বিজ্ঞান সংক্রান্ত বহু লেখাই লিখেছেন কৃষি বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা, বক্তৃতাও দিয়েছেন বাংলায় ও ইংরাজীতে। তবে ছোটদের জন্যে আলাদা পত্র পত্রিকাতে তিনি তেমন লেখেন নি। এর একমাত্র ব্যতিক্রম শিশুভারতী পত্রিকা।

শিশুভারতীতে প্রকাশিত পৃথিবীর আকার ও অবস্থান, যন্ত্রবিজ্ঞান, রঙ্গুন রশ্মি প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি নিয়েই প্রকাশিত হয়েছে মেঘনাদ আহার কিশোর রচনা সঙ্কলন। অপ্রকাশিত পত্রাবলী ও দুষ্প্রাপ্য ফটো সম্বলিত গ্রন্থটির সম্পাদনা করেছেন এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায় ও শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়। দাম ১৫

মেঘনাদ সাহা **কিশোর রচনা সঙ্কলন**

বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিশ্বের প্রথম সারির বিজ্ঞানীদের মধ্যে অন্যতম। শুধু তাই নয় মাতৃভাষার মাধ্যমে দেশের জনসাধারণের কাছে বিজ্ঞানের কথা প্রচার ও প্রসারের জন্য তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা তাঁকে এক অনন্য বিশিষ্টতা দান করেছে। তাঁর এই প্রচেষ্টার অন্যতম স্বাক্ষর জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার প্রকাশ, যে পত্রিকায় তিনি মাঝেমাঝেই বিজ্ঞান প্রবন্ধ লিখেছেন—বিজ্ঞানী ও মণীষীদের স্মৃতিচারণাও করেছেন। সেই সব রচনাবলী থেকে শুধুমাত্র কিশোর পাঠ্য রচনাবলীর বর্তমান সংস্করণটি নিঃসন্দেহে বিজ্ঞান পিপাসু পাঠকদের খুশী করবে। আচার্যদেবের অপ্রকাশিত চিঠিপত্র ও দুষ্প্রাপ্য ফটো সম্বলিত গ্রন্থটির সম্পাদনা করেছেন রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়। দাম ১৫

সত্যেন্দ্রনাথ বসু **কিশোর রচনা সঙ্কলন**

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ
৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯